এক টাকা সংস্করণ

গাঁটছড়া

পঞ্চম সংস্করণ

বৈশাখ—১৩৩৮

শ্রীনারায়ণচন্দ্র ভট্টাচার্য্য

ব-সাহিত্য-কুটীর,
, ঝামাপুকুর লেন, কলিকাতা

প্রকাশক—শ্রীসুবোধচন্দ্র মজুমদার
দেব-সাহিত্য-কুটীর
২১।১, ঝামাপুকুর লেন, কলিকাতা



প্রিণ্টার—শ্রীআশুতোষ মজুমদার
বি, পি, এমস্ প্রেস
২২।৫ বি, ঝামাপুকুর লেন কলিকাতা।



উৎসর্গ।

শ্রদ্ধাস্পদ

শ্রীযুক্ত বাবু যামিনীমোহন মুখোপাধ্যায়

মহাশয় করকমলেষু—

যামিনী বাবু, "গাঁট-ছড়া"র বাঁধন অচ্ছেদ্য বাঁধন। তাই আপনার সহিত সৌহৃদ্যবন্ধন কখনও ছিন্ন হইবে না এই উদ্দেশ্যে "গাঁট-ছড়া"র সহিত আপনার নাম সংযোজিত করিয়া দিলাম।

গুণমুগ্ধ—

গ্রন্থকার।

গাঁটছড়া।

—১—

"উলু উলু উলু—পোঁ—ও—ও।"

ইহা বাস্তব বিবাহের প্রকৃত শঙ্খধ্বনি বা উলুধ্বনি নহে, সকাল-বেলা এক পাল ছেলে-মেয়ে বোসেদের বাড়ীর সম্মুখবর্ত্তী বড় বকুলগাছটার তলায় সমবেত হইয়া ক্রীড়াচ্ছলে বিবাহের অনুকরণ করিতেছিল। কয়েকটি ছেলে বর এবং কয়েকটি মেয়ে ক'নে হইয়াছিল; কতকগুলি ছেলে বরযাত্রী সাজিয়াছিল, কতকগুলি কন্যা-যাত্রী সাজিয়া বর ও বরযাত্রীদের আদর-অভ্যর্থনায় নিযুক্ত হইয়াছিল। তাহাদের মধ্যে যেটি বয়ঃপ্রধান, সেই এগারো বারো বছরের মেয়েটি একাধারে বরকর্ত্তা, কন্যাকর্ত্তা, ও পুরোহিত সাজিয়া বৈবাহিক অনুষ্ঠান সকল সম্পন্ন করিতেছিল। বকুলপাতার লুচি, কাদার তরকারি ও ইটের টুকরার সন্দেশ বরযাত্রীদের ভোজনের জন্য প্রস্তুত হইয়াছিল। এক এক জন বরের পাশে এক এক ক'নে দাঁড়াইয়াছিল। সেই বয়ঃপ্রধান মেয়েটি তাহাদিগকে বকুলফুলের মালায় সুসজ্জিত করিয়া, তাহাদের

সম্মুখে দাঁড়াইয়া প্রবীণা গৃহিণীর মত একেবারে চারিটি বরের বরণকার্য্য সম্পন্ন করিতেছিল। অন্যান্য ছেলে-মেয়েরা, এমন কি, বর ক'নেরা পর্য্যন্ত উলুধ্বনি দিয়া, মুষ্টিবদ্ধ হস্তমধ্যে ফুৎকার প্রদান পূর্ব্বক শঙ্খ-ধ্বনির অনুকরণ করিয়া বোসেদের বকুলতলাকে যেন উৎসবময় করিয়া তুলিয়াছি।

"তোদের এ সব কি হচ্চে রে?"

কথাটা যে বলিল, তাহার মত ছেলে-মেয়েদের মধ্যে ভীতিস্থল গ্রামে আর কেহ ছিল কি না বলা যায় না। স্নিগ্ধোজ্জ্বল শারদ প্রভাতে সহসা গুরু-গম্ভীর মেঘগর্জ্জনের ন্যায় সেই ভীতিকর কণ্ঠধ্বনি শ্রবণে বালকদল চমকিয়া উঠিল এবং আকস্মিক ভীতির ছায়ায় তাহাদের আনন্দ-প্রফুল্ল মুখমণ্ডল মেঘচ্ছায়া-বিমলিন কমলের ন্যায় ম্লান বিশুষ্ক হইয়া আসিল। শুধু একজনের মুখে ভয়ের চিহ্ন দেখা গেল না; সে সেই বড় মেয়েটি। সে নির্ভীকভাবে প্রশ্নকর্ত্তা যুবকের দিকে চাহিয়া সহাস্যমুখে বলিল, "আমাদের সব বিয়ে হচ্চে; তুমি বিয়ে করবে উপীনদা?"

এই কথা শুনিয়া উপেনের গম্ভীর মুখে হাসির রেখা দেখা দিল। সে হাসিতে হাসিতে মেয়েটির সম্মুখবর্ত্তী হইয়া বলিল, "কাকে বিয়ে করবো গৌরী? তোকে?"

গৌরী ঘাড় বাঁকাইয়া উপহাসের হাসি হাসিয়া উত্তর করিল, "ইঃ, আমাকে! এস, তুমি যেমন বর, তেমনি ক'নে জুটিয়ে দিই।"

বলিয়াই সে খপ্ করিয়া উপেনের কোঁচার খুঁটটা ধরিয়া ফেলিল। তাহার হাতের কাছেই একটি কালো মেয়ে দাঁড়াইয়াছিল। মেয়েটা শুধু কালো নয়; যেমন কালো, তেমনি রোগা, মুখখানা অস্বাভাবিক লম্বা, সাম্‌নের দাঁতগুলো উঁচু, নাকটা বসা, কপালটা প্রশস্ত ময়দানের

মত লম্বা-চওড়া, চোখ দুইটা কটা। গৌরী এক হাতে উপেনের কোঁচার খুঁট, অপর হাতে সেই মেয়েটার আঁচল ধরিয়া গ্রন্থি দিতে দিতে বলিল, "এই নাও উপীনদা, তোমার ক'নে। আমি মেনীর সঙ্গে তোমার বিয়ে দিয়ে তোমাদের গাঁট-ছড়া বেঁধে দিলুম। উলু উলু উলু, পোঁ—ও—ও।"

যে উপেন বালকবালিকাগণের ভীতিস্থল, সেই উপেনকে গৌরীর নিকট এইরূপে অপদস্থ হইতে দেখিয়া অন্যান্য ছেলেমেয়েদেরও আনন্দের সীমা রহিল না। তাহারাও মহোৎসাহে গৌরীর সহিত যোগ দিয়া উচ্চকণ্ঠে ধ্বনি তুলিল, "উলু উলু উলু, পোঁ—ও—ও।"

গৌরী এমনই ক্ষিপ্রতার সহিত আরব্ধ কার্য্য সম্পন্ন করিল যে, উপেন তাহাতে বাধা দিবার অবসরমাত্র পাইল না; সে যেন কিংকর্ত্তব্যবিমূঢ় হইয়া গৌরীর এই দুঃসাহসিক কার্য্য সন্দর্শন করিতে লাগিল। তার পর গৌরীর সঙ্গে অন্যান্য ছেলেরাও যখন উলুধ্বনির উচ্চরোল তুলিয়া দিল, তখন রাগে তাহার চোখ দুইটা যেন কপালে উঠিল, এবং দন্তে অধর নিষ্পেষিত করিয়া দুঃসাহসিকা গৌরীকে শাস্তিপ্রদানে উদ্যত হইল। গৌরী কিন্তু পূর্ব্ব হইতেই সাবধান হইয়া পড়িয়াছিল। উপেন তাহাকে ধরিবার জন্য হস্ত প্রসারণ করিবার পূর্ব্বেই সে গ্রন্থিবন্ধন কার্য্য শেষ করিয়া চঞ্চলা হরিণীর ন্যায় উপেনের আয়ত্তের বাহিরে গিয়া দাঁড়াইল। উপেন তাহাকে ধরিবার জন্য অগ্রসর হইল। কিন্তু সে গৌরীকে ধরিতে পারিল না; মেনীর কাপড়ের সঙ্গে তাহার কোঁচার খুঁট আবদ্ধ ছিল, সুতরাং ছুটিতে যাইতেই পশ্চাতে টান পড়িল; কাজেই তাহাকে দাঁড়াইয়া পড়িতে হইল। গৌরী তাহার দুরবস্থা দেখিয়া, হাততালি দিয়া হাসিতে হাসিতে বলিল, "দুও, দুও, উলু উলু উলু, পোঁ—ও—ও।"

উলুধ্বনি দিতে দিতে গৌরী ছুটিয়া পলাইল। ছেলেমেয়ের 'পোঁ—ও' শব্দ করিতে করিতে তাহার অনুসরণ করিল। উ যথাস্থানে দাঁড়াইয়া নিষ্ফল আক্রোশে গর্জ্জন করিতে লাগিল।

সকলেই পলাইল, শুধু পলাইতে পারিল না মেনী। উপে কোঁচার খুঁটের সঙ্গে তাহার আঁচল বাঁধা। সুতরাং সে উপে সম্মুখে চোরের মত ভীতিবিবর্ণ মুখে নীরবে দাঁড়াইয়া রহিল।

অপর সকলে আয়ত্তের বাহিরে চলিয়া গেলে উপেনের স আক্রোশ পড়িল মেনীর উপর। সে রাগে চোখ দুইটাকে ল করিয়া কঠোর দৃষ্টিতে মেনীর দিকে চাহিয়া গর্জ্জন সহকারে বলি "তুই দাঁড়িয়ে রইলি যে ?"

মেনী নিরুত্তর। তাহার আঁচলের গেরো খুলিয়া না দিলে তাহার যাইবার উপায় নাই, এই সহজ উত্তরটাও সে ভয়ে দিতে পারি না। উপেন তাহার ভীতিবিবর্ণ বিশ্রী মুখখানার দিকে চাহিয়া ঘৃণা সূচক মুখভঙ্গী করিয়া বলিল, "মরণ আর কি! মুখের ভঙ্গীখান একবার দেখ!"

মেনী কিছু বলিল না; সে ভয়ে মুখখানাকে আরও নীচু করিল উপেন তখন নিজের কোঁচার খুঁট হইতে তাহার আঁচলের গেরো খুলিয়া দিল; তার পর তাহার পৃষ্ঠে এক প্রচণ্ড চপেটাঘাত করিয়া বলিল, "বেরো এখান থেকে।"

মেনী কাঁদিয়া উঠিল। চীৎকার করিয়া কাঁদিল না, নীরবে ফুলিয়া ফুলিয়া কাঁদিতে লাগিল। উপেন তাহার দিকে আর একবার ঘৃণাপূর্ণ দৃষ্টি নিক্ষেপ করিয়া সম্মুখের পথে অগ্রসর হইল।

কিছু দূর গিয়াই উপেন দাঁড়াইয়া পড়িল, এবং পশ্চাতে ফিরিয়া দেখিল, মেনী যায় নাই, সেই স্থানেই দাঁড়াইয়া ফুলিয়া ফুলিয়া

টছড়া



কাঁদিতেছে। বাঃ রে, মেয়েটা এখনও যায় নাই! ওঃ, ভারী কান্না তো? উপেনের ইচ্ছা হইল, ফিরিয়া গিয়া তাহাকে আরও দুই এক ঘা বসাইয়া দেয়। কিন্তু তখনই মনে হইল, না, মেনীর দোষ কি? যত পাজীর মূল গৌরী। তাহাকে দুই এক ঘা দিতে পারিলে তবে রাগ যাইত। মেনীকে চাপড়টা মারা ঠিক হয় নাই। ও বেচারী তো আমার মতই বিপন্ন হইয়া পড়িয়াছিল।

উপেন ফিরিয়া মেনীর কাছে আসিল, এবং গম্ভীর কণ্ঠে তাহাকে সম্বোধন করিয়া বলিল, "এখানে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে কাঁদছিস্ যে?"

মেনী নিরুত্তরে দুই হাতে চোখ রগড়াইতে লাগিল। উপেন তখন স্বীয় কার্য্যের অন্যায্যতা তাহাকে বুঝাইয়া দিবার অভিপ্রায়ে অপেক্ষাকৃত নরম স্বরে বলিল, "দেখ্, রাগের মাথায় তোকে এক ঘা বসিয়ে দিয়েছি। তা কেঁদে আর কি হবে, ঘরে যা। আর দেখ্, কক্ষনো যেন গৌরী ছুড়ীর সঙ্গে খেলা করিস্ না। ও ছুড়ী বড় ঠ্যাঁটা। এখন যা।"

মেনী ভয়প্রযুক্তই হউক, বা এখানে দাঁড়াইয়া থাকা নিরর্থক বিবেচনাতেই হউক, চোখ রগড়াইতে রগড়াইতে ধীরে ধীরে চলিয়া গেল। উপেন তাহার দিকে চাহিয়া চাহিয়া ঘৃণা-কুঞ্চিত মুখে আপন মনে বলিল, "আহা, ভগবান্ কি মেয়েই গড়েছেন! মুখের গড়নটাও যদি ভাল হ'তো!"

তা শুধু উপেন বলিয়া নয়, পরেশ মিত্তিরের এই মেয়েটিকে যে দেখিত, সে-ই ঘৃণায় নাসা কুঞ্চিত না করিয়া থাকিতে পারিত না। মা গো মা, এমন মেয়েও পেটে ধরিতে হয়! পেটে ধরিবার পক্ষে মায়ের কোন হাত না থাকিলেও অনেকে মেনীর মাকে রত্নগর্ভা বলিয়া উপহাস করিতে ছাড়িত না। জগতে কালো অনেক আছে,

কিন্তু এমন বিশ্রী কালো, আর সেই কালোর উপর এমন বিশ্রী চেহারা পৃথিবীতে বোধ হয় আর একটিও নাই। লোককে কুৎসিত আকৃতির আদর্শ দেখাইবার জন্যই যেন ভগবান্ নির্জ্জনে বসিয়া ইহাকে মনোমত কুৎসিত করিয়া গড়িয়াছেন।

অপরে মেনীর সম্বন্ধে এইরূপ তীব্র মন্তব্য প্রকাশ করিলেও মেনীর মা কিন্তু মেয়ের উপর একটুও ঘৃণা পোষণ করিতে পারিতেন না। এই মেয়েই যে তাঁহার সর্ব্বস্ব—সংসারের একমাত্র বন্ধন। স্বামী গিয়েছেন, তাঁহার প্রায় সঙ্গে সঙ্গে রাজপুত্রের মত দশ বছরের ছেলে, ফুটন্ত ফুলের মত চার বছরের মেয়ে ফাঁকি দিয়া চলিয়া গিয়াছে; শুধু কালো কুৎসিত বলিয়াই যম বুঝি মেনীকে উপেক্ষা করিয়া ফেলিয়া রাখিয়াছে। তা হউক কালো কুৎসিত; কুৎসিত হইয়াও তো সে মায়ের তপ্ত বুকখানা জুড়িয়া রহিয়াছে! দেখিতে বিশ্রী হইলেও তাহার মুখের মাতৃ-সম্বোধন তো বিশ্রী নয়? সে সম্বোধন শুনিলে মায়ের শোকদগ্ধ বুকখানা যে বৃষ্টি-ধারাস্পর্শে নিদাঘতপ্ত ধরণীর মত মুহূর্ত্তে শীতল হইয়া যায়! কালো কুৎসিত হইয়াই মেনী বাঁচিয়া থাক্! আহা, সে দু'টাও সুন্দর না হইয়া যদি ইহার অপেক্ষাও কুৎসিত হইয়া বাঁচিয়া থাকিত? বিবাহ—ভাগ্যে থাকে হইবে, না হয় আইবুড়ো হইয়াই চিরদিন তাঁহার বুক জুড়িয়া থাকিবে। লোকের নিন্দায় তাঁহার মাতৃহৃদয় তো স্নেহাস্বাদে বঞ্চিত হইবে না।

কিন্তু পাঁচজনে এত কথা বুঝিত না, বুঝিবার প্রয়োজনও তাহাদের ছিল না। সুতরাং তাহারা মায়ের কাছেই মেয়ের রূপের কঠোর সমালোচনা করিয়া আপনাদের সৌন্দর্য্য-বোধশক্তির পরিচয় দিতে কুণ্ঠিত হইত না। তাহাদের সেই কঠোর সমালোচনা শ্রবণে মায়ের প্রাণ যে কি শেলাঘাতের বেদনা অনুভব করিত, তাহা

কেহই ভাবিয়া দেখিবার অবসর পাইত না। মেয়ের নিন্দায় মায়ের চোখ জলে ভরিয়া উঠিত, বুকের পাঁজরাগুলাকে যেন ভাঙ্গিয়া দিয়া বেদনার গভীর দীর্ঘশ্বাস বাহির হইবার উপক্রম করিত। কিন্তু সে দীর্ঘশ্বাস, সে অশ্রু চাপিয়া রাখিয়া তাঁহাকে বলিতে হইত, "কি করবো মা, মেয়ের দোষ নাই, আমার পোড়া কপালের দোষ; নইলে এমন মেয়ে পেটে জন্মাবে কেন? ওর আগে একটা, পরেও তো একটা জন্মেছিল, তারা তো অমন হয় নি। কিন্তু যম কি তাদের রাখলে!"

মাতার এই কাতরোক্তিতে যাহাদের প্রাণে সহানুভূতির উদ্রেক হইত, তাহারা তাঁহাকে সান্ত্বনা দিয়া বলিত, "তা হোক্, তা হোক্, কালো কুচ্ছিত হয়েই বেঁচে থাক্! তবু তো কোল জুড়ে রয়েছে।"

কিন্তু পরিণামের দিকে যাঁহাদের দৃষ্টিটা তীক্ষ্ণ, তাঁহারা এরূপ ব্যর্থ সান্ত্বনায় সন্তুষ্ট হইতে না পারিয়া চিন্তিতভাবে মন্তব্য প্রকাশ করিতেন যে, মায়ের কোল-জোড়া হইয়া বাঁচিয়া থাকায় তাঁহাদের কোনও আপত্তি নাই, বরং ইহাই সকলের প্রার্থনীয়। কিন্তু মেয়ে শুধু বাঁচিয়া থাকিলে তো হইবে না, তাহার বিবাহ দিতে হইবে, এবং সেই বিবাহ দেওয়াই বিষম বিপদের কার্য্য। একে তো আজকাল মেয়ের বিবাহ দেওয়া দায় হইয়া উঠিয়াছে, তাহার উপর মেয়ে কালো কুচ্ছিত হইলে তাহাকে পার করা একেবারে দুঃসাধ্য হইবে। মেনীর মায়ের তেমন পয়সার জোর নাই যে, দুই চারি হাজার ঢালিয়া দিতে পারিবে। সুতরাং মেয়ের বিবাহ লইয়া মেনীর মাকে বিষম বিপদেই পড়িতে হইবে।

পাঁচজনের কাছে এইরূপ পাঁচরকম কথা শুনিয়া মাও সময়ে

সময়ে ভীত ও চিন্তিত হইয়া পড়িতেন। সত্য কথা,—বেটাছেলে নয় যে, বিবাহ না হইলেও ক্ষতি নাই, মেয়েছেলেকে কত দিন আইবুড়ো রাখা যাইবে? বড় জোর বারো তেরো বছর; তারপর বিবাহ না দিলে লোক নিন্দা, দুর্নাম, অপবাদ—নানা বিভ্রাট। কিন্তু মেনীর বিবাহ দেওয়া তো দুইচারি শত টাকার কর্ম্ম নয়, হাজার টাকা দিলেও কেহ উহাকে ঘরে লয় কি না সন্দেহ। হা ভগবান্, যাহার দশ টাকার সংস্থান নাই, একরূপ পরের দাসীবৃত্তি করিয়া কোনরূপে পেট চলিতেছে, তাহার পক্ষে হাজার টাকার কথা বোবার স্বপ্নদর্শনমাত্র। মেয়েও তো নয় ছাড়াইয়া দশে পা দিয়েছে; আর বড় জোর দুইটা বৎসর। এই দুই বৎসর পরে কি হইবে? অনেক ভাবিয়াও মেনীর মা এই চিন্তাসমুদ্রের কুলকিনারা দেখিতে না পাইয়া হতাশ হইয়া পড়িতেন। ওঃ, ভগবান তাঁহার শোকদগ্ধ বুকে এ কি চিন্তার বোঝা চাপাইয়া দিয়াছেন! মা যখন এই ভারী বোঝা নামাইবার কোন উপায়ই খুঁজিয়া পাইতেন না, তখন তাঁহার চিত্তটা দুঃখে নৈরাশ্যে অধীর হইয়া উঠিত। পরিশেষে সেই দুঃখটা ক্রোধের আকারে পরিণত হইয়া মেয়ের উপর গিয়া পড়িত। হায়, হতভাগা মেয়েটা যদি এই পোড়াকপালীর পেটে আসিয়া জন্মিল, তবে একটু রূপ লইয়া আসিল না কেন? তাহা হইলে তো তাঁহাকে মড়ার উপর এই খাঁড়ার ঘা সহিতে হইত না। মেনী যেন ইচ্ছা করিয়াই রূপ লইয়া আসে নাই, ইহাই স্থির করিয়া লইয়া মা মধ্যে মধ্যে মেয়েকে বেশ পাঁচ কথা শুনাইয়া দিতেন।

মেয়ে কিন্তু চুপ করিয়াই মায়ের কথা শুনিত। মেনীর রূপ না থাকিলেও একটা গুণ ছিল—সহিষ্ণুতা। কত ছেলে-মেয়ে, এমন কি

বুড়ারা পর্য্যন্ত রূপহীনতার জন্য তাহার মুখের উপর ঘৃণা বা উপহাস করিতে থাকিত, মেনী কিন্তু তাহার উত্তরে একটি কথাও বলিত না, একটুও রাগ দেখাইত না, শুধু ছলছল চোখে উপহাসকারীদের মুখের দিকে চাহিয়া থাকিত। তাহার সেই সজল দৃষ্টি যেন সকলের দয়া প্রার্থনা করিয়া নীরব ভাষায় ব্যক্ত করিত—ওগো, এই রূপ-হীনতার জন্য আমি দায়ী নহি, যিনি আমার স্রষ্টা তিনি এজন্য দায়ী; তবে রূপের অভাবের জন্য আমাকে তিরস্কার করিয়া কেন বৃথা আমার মর্ম্মে আঘাত দিতেছ? রূপহীনতার জন্য আমি নিজে যে কতটা দুঃখিত, তাহা কি তোমরা বুঝ না?

কিন্তু তাহার এই নীরব ভাষা বুঝিবার শক্তি কাহারও ছিল না; সুতরাং সে মৌন সজল দৃষ্টি দ্বারা কাহারও দয়া আকর্ষণ করিতে না পারিয়া তাহাদের তীব্র তিরস্কার নীরবে শুনিয়া যাইত।

মা কিন্তু কতকটা বুঝিতেন। তিরস্কার করিতে করিতে মেয়ের জলভরা চোখের উপর চোখ পড়িলেই তাঁহাকে থামিয়া যাইতে হইত। শুধু থামিয়াই তিনি নিষ্কৃতি পাইতেন না; তাঁহার অহেতুক তিরস্কারে মেয়ে অন্তরে কতকটা ব্যথা পাইয়াছে তাহা অনুভব করিয়া লইয়া স্বীয় অবিমৃষ্যকারিতার জন্য অনুতপ্ত হইয়া পড়িতেন, এবং মেয়ের বেদনাকাতর মুখের দিকে চাহিয়া কাঁদিয়া ফেলিতেন।

মাকে কাঁদিতে দেখিয়া মেনী তাঁহাকে সান্ত্বনা দিয়া বলিত, "কাঁদিস্ কেন মা, আমি কালো কুচ্ছিত হয়েছি ব'লেই তো তোর এত কষ্ট। আমি যদি সুন্দর হতাম!"

মা মেয়েকে বুকে জড়াইয়া ধরিয়া অশ্রুধারায় তাহার মস্তক অভিষিক্ত করিতে করিতে বলিতেন, "না মেনী, তোর সুন্দর হয়ে কাজ নাই; তুই আমার কালো কুচ্ছিত হয়েই বেঁচে থাক্।"

মায়ের কথায় মেনীর বেদনা-মলিন মুখে হাসির রেখা ফুটিয়া উঠিত, এবং সে হাসিটুকু মায়ের চিন্তাতমসাচ্ছন্ন হৃদয়কে তৃপ্তি ও সান্ত্বনার আবেগে আলোকিত করিয়া দিত।

গোড়ায় নামটা মৃণালিনী রাখা হইয়াছিল, কিন্তু এত বড় নামটা সর্ব্বদা উচ্চারণ করা যায় না, কাজেই মৃণালিনী সংক্ষিপ্ত সংস্করণে মেনী হইয়া দাঁড়াইয়াছিল, এবং মৃণালিনীর পরিবর্ত্তে মেনী নামটাই সেই কুৎসিত মেয়েটিকে যেন বেশ মানাইয়া গিয়াছিল।

পরেশ মিত্তির স্থানীয় জমিদারের অধীনে গোমস্তাগিরি করিতেন, এবং পার্ব্বণী ও সেলামীর আয়ে কিছু জমী-জায়গাও করিয়াছিলেন। কিন্তু তাঁহার জমী-জায়গার এই ক্রমিক উন্নতি প্রতিবেশীদের মধ্যে কাহারও কাহারও অসহ্য হইয়া উঠিল। এই অসহিষ্ণুতার ফলে শীঘ্রই জমিদারের কানে উঠিল যে, পরেশ মিত্তির জমিদার বাবুকে ফতুর করিয়া নিজে জমিদার হইয়া বসিবার সঙ্কল্প করিয়াছে, এবং অচিরেই বোধ হয় তাহার এই সঙ্কল্প সিদ্ধ হইবে। শুনিয়া জমিদার বাবু শিহরিয়া উঠিলেন এবং পরেশ মিত্তিরকে শীঘ্র তাহার সদরে হিসাব দাখিল করিবার জন্য কড়া হুকুম প্রচার করিলেন। মনিবের কাছে নিকাশ দিবার জন্য পরেশ হিসাবপত্র দোরস্ত করিতে ব্যস্ত হইয়া পড়িলেন। কিন্তু তিনি নিকাশ দিবার অবসর পাইলেন না; তাহার পূর্ব্বেই চিত্রগুপ্তের নিকট নিকাশ দিবার জন্য জোর তলব আসিল। অগত্যা পরেশ জমিদারের হিসাব নিকাশ ফেলিয়া চিত্রগুপ্ত মহাশয়ের নিকট স্বীয় কৃত কার্য্যের হিসাব দিবার জন্য সত্বর চলিয়া যাইতে বাধ্য হইলেন।

তিনি চলিয়া গেলেও জমিদার কিন্তু ছাড়িলেন না। তিনি দুই হাজার টাকা তহবিল তছরুপাতের দাবী করিয়া বসিলেন, এবং

আদালতের বিচারে পরেশ মিত্তিরের সম্পত্তি হইতে এই টাকা আদায় করিয়া লইবার অধিকার প্রাপ্ত হইলেন। সেই অধিকারের বলে জমিদার বাবু পরেশ মিত্তিরের জমী-জায়গা একে একে নীলামে চড়াইয়া ডাকিয়া লইতে লাগিলেন। শেষে বাস্তুভিটায় পর্য্যন্ত টান ধরিল। বাসচ্যুতির-ভয়ে পরেশের বিধবা স্ত্রী নিস্তারিণী কাতর হইয়া পড়িলেন, এবং বাস্তুটুকু রাখার জন্য প্রতিবেশীদের পায়ে হাতে ধরিতে লাগিলেন। এই সময়ে প্রতিবেশীদের মধ্যে একটি লোক তাঁহার যথেষ্ট উপকার করিল; বিধবার কাতরক্রন্দনে আর্দ্র হইয়া দয়ারাম ঘোষ তাঁহাকে রক্ষা করিতে চেষ্টিত হইলেন, এবং জমিদারের পায়ে হাতে ধরিয়া বাকী এক হাজার টাকার দাবী সাত শত টাকায় রফা করিয়া ফেলিলেন। তার পর নিস্তারিণীর সঞ্চিত অর্থ ও অলঙ্কারপত্র যাহা কিছু ছিল, সে সমস্ত দিয়া জমিদারের দাবী মিটাইয়া দিলেন। নিস্তারিণী এজন্য দয়ারামের নিকট কৃতজ্ঞ হইয়া থাকিলেও লোকে কিন্তু এই উপকারী ব্যক্তিটির এরূপ পরোপকারপ্রবৃত্তির কারণ অনুসন্ধান পূর্ব্বক প্রচার করিল যে, এই সাত শত টাকার মধ্যে পাঁচ শত টাকা জমিদার এবং দুই শত টাকা দয়ারাম নিজে লইয়াছেন। উপকারকের এইরূপ মিথ্যা দুর্নামে নিস্তারিণী কিন্তু কর্ণপাত করিলেন না; দয়ারামের কৃপায় তাঁহার বাস্তুভিটা ও নিষ্কর সাড়ে সাত বিঘা জমী যে জমিদারের গ্রাস হইতে রক্ষা পাইল, ইহাই যথেষ্ট সৌভাগ্য জ্ঞান করিয়া তিনি দয়ারাম ঘোষের নিকট কৃতজ্ঞতা-ঋণে আবদ্ধ হইয়া রহিলেন।

তা যদি এই সাত বিঘা জমীর পূরা ফসল পাওয়া যাইত, তাহা হইলেও দুইটা পেট চলিবার পক্ষে কিছুমাত্র কষ্ট হইত না। কিন্তু পূরা ফসল দূরের কথা, সিকিও পাওয়া যাইত কি না সন্দেহ।

সাড়ে সাত বিঘার মধ্যে তিন বিঘা জমী ক্রোশ দুই দূরে ভিন্ন গ্রামে অল্প খাজনায় বিলি ছিল। সে অল্প খাজনাও মেয়েমানুষ——সব সময়ে আদায় করিতে পারিত না। গ্রামের মাঠে যে সাড়ে চারি বিঘা জমী ভাগজোতে বিলি ছিল, নামে তাহার অর্দ্ধেক ফসল পাইবার কথা থাকিলেও সিকি পরিমাণ ফসলমাত্র ঘরে আসিত, এবং তাহাতে মা ও মেয়ের তিন চারি মাসের বেশী চলিত না। বাকী কয়মাস কাহারও বাড়ীতে রাঁধিয়া দিয়া, কাহারও মুড়ী ভাজিয়া, কাহারও কাঁথা শেলাই করিয়া, কখন বা ঘটিটা বাটিটা বেচিয়া বা বাঁধা দিয়া কষ্টেস্বষ্টে চালাইতে হইত। যদি প্রতি মাসে হিন্দু বিধবার একাদশী, আমাবস্যা, পূর্ণিমা প্রভৃতির উপবাস না থাকিত, তাহা হইলে দিন চালান নিস্তারিণীর পক্ষে আরও কষ্টকর হইয়া উঠিত।

এই কষ্টটা নিস্তারিণীর কাছে তেমন দুঃসহ হইয়া উঠিত না যদি পাঁচজনে মেয়ের বিবাহের দুঃসাধ্যতা বুঝাইয়া দিয়া তাঁহার ক্লেশনিপীড়িত চিত্তে চিন্তার দুঃস্বপ্ন জাগাইয়া না তুলিত। উদারন্নের চিন্তার সঙ্গে এই ভীষণ চিন্তা-সমুদ্রে নিপতিত হইয়া নিস্তারিণী যেন হাবুডুবু খাইতে লাগিলেন, কোন দিকেই কিছু কূল-কিনারা দেখিতে পাইলেন না। প্রতিবেশীদের মধ্যে যাহারা মেনীর বিবাহের জন্য অতিশয় চিন্তিত, তাহারাও মেনীর মাকে এই অপার চিন্তা-সমুদ্রের কোন দিকেই কূল দেখাইতে সমর্থ হইলেন না।

শুধু একজন কূলের একটু রেখা যেন দেখাইয়া দিল; তিনি দয়ারাম ঘোষ। দয়ারাম নিস্তারিণীর দুর্ভাবনা শ্রবণে তাঁহাকে আশ্বাস দিয়া বলিলেন, "ভয় কি জমী ক'বিঘে তো আছে।"

অকূলে কূল দেখিতে পাইয়া নিস্তারিণী কতকটা আশ্বস্ত হইলেন।

—২—

"মেনীর বর, ও মেনীর বর !"

উপেন যাইতে যাইতে থমকিয়া দাঁড়াইল, এবং ইতস্ততঃ দৃষ্টি সঞ্চালন পূর্ব্বক অদূরে বৃক্ষান্তরালে লুক্কায়িতা গৌরীকে দেখিতে পাইয়া, বলিল "কে, গৌরি ? শোন্ ।"

"আমি শুন্‌তে পাচ্ছি, তুমি বল না ।"

"এত দূর থেকে কি বলবে ? কাছে আয় না"

ঘাড় দোলাইয়া চোখ টিপিয়া গৌরী বলিল, "হু, আমি কাছে যাই, আর তুমি আমাকে মারো ।"

মারিবার ইচ্ছা থাকিলেও তাহা গোপন করিয়া সহাস্যমুখে উপেন বলিল "না না, মারবো না, তোর ভয় নাই ।"

মাথা নাড়িয়া গৌরী বলিল, "ভয় নাই বৈ কি, তুমি নিশ্চয় মারবে ।"

"নিশ্চয় মারবো না ।"

"মা কালীর দিব্যি ?"

"মা কালীর দিব্যি ?"

"যদি মারো ?"

"দিব্যি করলুম, আর কি মাত্তে পারি ?"

"আচ্ছা, তবে কি বল্‌বে বল ।"

গৌরী বৃক্ষান্তরাল ত্যাগ করিয়া ধীরে ধীরে উপেনের সম্মুখে আসিয়া দাঁড়াইল। দাঁড়াইবামাত্র উপেন তাহার হাতখানা খঁা করিয়া ধরিয়া ফেলিল এবং রোষগম্ভীর কণ্ঠে বলিল, "এইবার !"

গৌরী মনে মনে ভয় পাইলেও মুখে সাহস দেখাইয়া জিজ্ঞাসা করিল, "এইবার কি ?"

"এইবার যদি মারি ?"

"মা কালীর নামে দিব্যি করলে যে।"

"দিব্যি আমি মানি না।"

"না মানলে মা কালী তোমাকে শাপ দেবে তা জান ?"

"কি শাপ দেবে ?"

গৌরী কোন্ শাপের উল্লেখ করিয়া উপেনকে ভয় দেখাইবে, তাহা সহসা ভাবিয়া পাইল না। একটু ইতস্ততঃ করিয়া বলিল, "তা হ'লে—তা হ'লে ঐ মেনীর মত মেয়ের সঙ্গে তোমার বিয়ে হবে।"

ঈষৎ হাসিয়া উপেন জিজ্ঞাসা করিল, "আর যদি না মারি ?"

প্রফুল্লমুখে গৌরী বলিল, "তা হ'লে ভাল বৌ হবে।"

উপেন তাহার মুখের উপর হাস্যোজ্জ্বল দৃষ্টি নিক্ষেপ করিয়া বলিল, "কি রকম ভাল ? তোর মতন ?"

লজ্জারক্ত মুখখানা নীচু করিয়া গৌরী বলিল, "দূর, তা কেন, খুব্ সুন্দর টুক্‌টুকে বৌ।"

"তুই তো সুন্দর টুক্‌টুকে।"

হাস্যরঞ্জিত মুখখানাকে ভারী করিয়া গৌরী উত্তর করিল, "তোমাকে বলেছে, আমি টুক্‌টুকে! যাও।"

উপেনের মুষ্টি হইতে আপনার হাতখানাকে মুক্ত করিবার জন্য গৌরী স্বীয় হস্ত আকর্ষণ করিল। উপেন কিন্তু তাহাকে ছাড়িল না; বরং মুষ্টিটা আরও দৃঢ় করিয়া গম্ভীর মুখে বলিল, "আমি তো চ'লে যাচ্ছিলাম, তুই ডাক্‌লি কেন ?"

যেন অতিমাত্র আশ্চর্য্যান্বিতভাবে গৌরী বলিল, "ও মা, তোমাকে আবার ডাকলুম কখন্ ?"

উপেন বলিল, "তবে 'মেনীর বর, মেনীর বর, ব'লে কে আমাকে ডাক্‌লে ?"

সপ্রতিভভাবে গৌরী বলিল, "ওঃ, মেনীর বর ব'লে ডেকেছি। তা ডাকলেই বা, তুমি তো আর সত্যি সত্যি মেনীর বর নও।"

উপেন। তবে মেনীর বর ব'লে ডাকলি কেন ?

গৌরী। আমি তো তোমাকে ডাকি নাই।

উপেন। তবে কাকে ডেকেছিলি ?

গৌরী। কাকে ?—ভূতকে।

"আচ্ছা, তোমার ঘাড়ের ভূতটা ছাড়িয়ে দিচ্চি।" বলিয়া উপেন সজোরে গৌরীর হস্ত আকর্ষণ করিল। সে আকর্ষণে ব্যথা পাইয়া গৌরী বলিয়া উঠিল, "উহু, হাতে লাগছে, ছেড়ে দাও।"

উপেন দাঁতে ঠোঁট চাপিয়া বলিল, "ছাড়বো বৈ কি।"

গৌরী এবার গ্রীবা উন্নত করিয়া সতেজকণ্ঠে বলিল, "কি করবে ? মারবে ?"

মুখভঙ্গী করিয়া উপেন বলিল, "না, মারবো কেন, আদর করবো।"

রাগে মুখখানা লাল করিয়া গৌরী বলিল, "কেন মারবে বল তো, আমি কি করেছি ?"

ধীরে ধীরে মাথাটা নাড়িতে নাড়িতে উপেন উত্তর করিল, "কি আর করবে, সে দিন শুধু ছেলেগুলোর সামনে আমাকে অপমান করেছ।"

যেন নিতান্ত নিরপরাধের মত কাঁদ-কাঁদ মুখে গৌরী বলিল, "ও মা, অপমান আবার করলুম কখন ? আমরা বিয়ে বিয়ে খেলা কচ্ছিলুম—"

গম্ভীর কণ্ঠে উপেন বলিল, "আর আমি গিয়ে পড়তেই মেনীর সঙ্গে আমার বিয়ে দিয়ে ফেললে।"

উপনের রাগের কারণ বুঝতে পারিয়া গৌরীর হাসি আসিল। কিন্তু সে হাসি চাপিয়া গম্ভীর মুখে বলিল, "তা দিলেই বা বিয়ে। সে তো আর সত্যিকার বিয়ে নয়, খেলাঘরের বিয়ে।"

তর্জ্জন সহকারে উপেন বলিল, "হলেই বা খেলাঘরের বিয়ে। কেন, ঐ মেয়েটা ছাড়া সেখানে কি আর মেয়ে ছিল না?"

গৌরী আর হাসি চাপিতে পারিল না, ফিক্ করিয়া হাসিয়া ফেলিল; বলিল, "ওঃ, এই জন্যেই তোমার এত রাগ? তা মেনী এমন কি মন্দ মেয়ে উপীনদা?"

উপেন বলিল, "না, খুব চমৎকার মেয়ে। চমৎকার ব'লেই আজ ভালরকম ঘটক-বিদায় দেব।"

গৌরী কিন্তু ঘটকের প্রাপ্যের দিকে লক্ষ্য না করিয়াই সহাস্যে বলিল, "আচ্ছা উপীনদা, সত্যিই যদি মেনীর সঙ্গে তোমার বিয়ে হয়?"

উপেন বলিল, "তা হ'লে সে বিয়ের ঘটক এর চাইতেও ভাল বিদায় পাবে।"

গৌরী বলিল, "তা পাক্, কিন্তু নিশ্চয়ই মেনীর সঙ্গে তোমার বিয়ে হবে।"

উপেন। তুই খড়ি পেতেছিস্ না কি?

গৌরী। খড়ি পাতবো কেন, আমি মামীর কাছে শুনেছি। তোমার দিদি মামীমাকে বলেছে।"

"দিদি তোর মাথা খেয়েছে।" বলিয়া উপেন গৌরীর হাতটা যেন ঘৃণার সহিত ছুড়িয়া দিল। গৌরী আপনার হাতখানাকে

ঘুরাইয়া ফিরাইয়া দেখিতে দেখিতে সদুঃখে বলিল, "উঃ, তোমার চাষার মত কি কড়া হাত উপীনদা, দেখ দেখি আমার হাতটা লাল হয়ে উঠেছে।"

উপেন রোষ-কঠোর দৃষ্টিতে তাহার দিকে চাহিয়া বলিল, "তোর দাঁতগুলো যে এখনো ঠিক জায়গায় আছে, সেই ঢের। কিন্তু ফের যদি এই রকম তামাসা করবি—"

গৌরী বলিয়া উঠিল, "তামাসা নয় উপীনদা, সত্যিই তুমি মেনীর বর হবে, দেখে নিও, দেখে নিও, দেখে নিও,।'

"আচ্ছা, দাঁড়া তোকে দেখে নিচ্ছি।" বলিয়া উপেন পুনরায় তাহাকে ধরিতে উদ্যত হইলে গৌরী চঞ্চলপদে ধাবিত হইল, এবং ছুটিতে ছুটিতে বলিল, "ধত্তে পারলে না, দুও, ধত্তে পারলে না।"

খল্ খল্ হাস্য ধ্বনিতে নির্জ্জন পথ প্রতিধ্বনিত করিতে করিতে গৌরী ছুটিয়া পলাইল। উপেন কিয়ৎক্ষণ স্তব্ধভাবে সেইখানে দাঁড়াইয়া থাকিয়া ধীরে ধীরে গন্তব্য পথে অগ্রসর হইল।



এ স্থলে উপেনের কিঞ্চিৎ পরিচয় দেওয়া আবশ্যক। এগারো বছর বয়সে মা-বাপ দুই মারা গেলে মহাজন যখন দেনার দায়ে বাপের ঘর-ভিটা পর্য্যন্ত বেচিয়া লইল, তখন উপেনকে লেখা-পড়ার সঙ্গে সকল সম্বন্ধ বিচ্ছিন্ন করিতে তো হইলই, অধিকন্তু দুই বেলা দুই মুঠা ভাতের জন্য তাহাকে লালায়িত হইয়া পড়িতে হইল। দিন কতক এ-বাড়ী সে-বাড়ী খাইয়া বেড়াইয়া অপরের অনাদর-প্রদত্ত অন্নে যখন অরুচি

জন্মিয়া আসিল, তখন হঠাৎ একদিন বারোয়ারীতলায় যাত্রা শুনিতে শুনিতে সেই যাত্রার দলের সঙ্গে কোথায় চলিয়া গেল। পাঁচ ছয় বৎসর তাহার আর কোন সন্ধানই রহিল না।

ভগ্নী কুসুম স্বামী-গৃহে আসিয়াই ভ্রাতার এই নিরুদ্দেশ-সংবাদ পাইল এবং এই সংবাদ পাইয়া সে চিন্তিত ও কাতর হইয়া পড়িল। সে স্বামী, দয়ারামকে অনুরোধ করিয়া যতটুকু সম্ভব ভ্রাতার খোঁজ করিল, কিন্তু তাহার কোন খোঁজখবরই পাওয়া গেল না।

বছর পাঁচেক পরে হঠাৎ একদিন উপেন ছোট-বড় করিয়া ছাঁটা চুলে টেড়ী কাটিয়া, আদ্দির পাঞ্জাবীর আবরণে দেহের কৃশতা ও প্লীহাবর্দ্ধিত উদরের অস্বাভাবিক স্ফীতি আবৃত করিয়া, সিগারেটের ধূম উদ্গিরণ করিতে করিতে কুঁড়োজালি গ্রামে দেখা দিল। নিরুদ্দিষ্ট ভ্রাতার এরূপ আকস্মিক আগমনে কুসুম আনন্দে বিহ্বল হইল, কিন্তু তাহার পাঞ্জাবীর আবরণ হইতে বিমুক্ত দেহের অবস্থা দেখিয়া কাঁদিয়া ফেলিল।—"এ কি তোর চেহারা হয়েছে রে উপেন?"

সদুঃখে উপেন বলিল, "চেহারার কথা আর ব'ল না দিদি। ফেন-মেশানো কলায়ের দাল আর আধসিদ্ধ ভাত খেয়ে হাড় ক'খানা যে এখনো বজায় আছে, সেই ঢের। আগে মনে করেছিলাম, যাত্রার দলের মত মজা আর দুনিয়ায় নাই, কিন্তু এখন দেখছি, তার চাইতে লোকের গরু চরিয়ে ভাত খেলেও সুখ আছে। রোজ বিকেল হ'লে জ্বর হয়, আর ভোরবেলা সেই জ্বর ছাড়ে। আজ এক বছর এই জ্বর নিয়ে দলের সঙ্গে সঙ্গে এ গাঁ সে গাঁ ক'রে ঘুরে বেড়াচ্চি।"

কুসুম বলিল, "তা দল ছেড়ে পালিয়ে এলি না কেন?

উপেন বলিল, "উপায় থাকলে পালিয়ে আসতাম।—শা—অধিকারী দাদনের খাতার সই করিয়ে নিয়েছিল। যেখানে পালাব, পেয়াদা

দিয়ে টেনে নিয়ে যাবে। অধিকারী ব্যাটা যদি মারা না যেতো, তা হ'লে এই হাড় ক'খানাও ফিরে আসতো না বোধ হয়।"

শুনিয়া কুসুম চোখের জল মুছিতে মুছিতে বলিল, "আর তুই কিন্তু যাত্রার দলে যেতে পাবি না উপেন।"

দৃঢ় সঙ্কল্পের স্বরে উপেন বলিল, "আবার!"

ডাক্তারের ঔষধে এবং সুসিদ্ধ ভাত ও ফেনবর্জ্জিত ডাইলের গুণে দুই তিন মাসের মধ্যেই উপেনের চেহারার অনেক পরিবর্ত্তন হইয়া গেল। তাহার অস্থি-চর্ম্মসার দেহে মাংস দেখা দিল, প্লীহার আয়তন কমিয়া যাওয়ায় উদরের অস্বাভাবিক আয়তনও হ্রাস পাইল। সেই সঙ্গে টেড়ীর বাহার অন্তর্হিত হইল, ছোট বড় চুল ক্রমে সমান হইয়া আসিল। আদ্দির পাঞ্জাবীটা কোথায় যে রহিল, তাহা উপেন আর খুঁজিয়াও দেখিল না, সে কোঁচার খুঁট গায়ে দিয়া দয়ারামের গরু বাঁধিতে ও বাজার করিতে কিছুমাত্র সঙ্কুচিত হইল না।

ক্রমে গ্রামের মধ্যেও উপেনের একটা পরিচয় হইয়া গেল। সে কাহারও উপীনদা, কাহারও উপীনখুড়ো, কাহারও মামা হইয়া পড়িল। শুধু পুরুষমহলে নয়, মেয়েমহলেও এক একটা সম্পর্ক পাতাইয়া লইয়া সে অল্পদিনের মধ্যেই সকলের স্নেহ ও প্রীতি আকর্ষণ করিয়া লইল। শুধু ছেলের দলই কারণে অকারণে প্রহারকারী এই ক্রোধনস্বভাব যুবকটিকে ভীতির চক্ষে দর্শন করিতে লাগিল। ছেলে-মেয়েদের মধ্যে শুধু একটি মেয়ে উপেনকে ভয় করিত না; সে রামজয় বোসের দৌহিত্রী গৌরী।

ছেলেবেলায় মা মারা যাওয়ায় মাতামহী কাছে রাখিয়া গৌরীকে মানুষ করিয়াছিলেন। তার পর মাতামহী মারা গেলে মাতুলানী মাতার ন্যায় স্নেহে ও আদরে গৌরীকে প্রতিপালন করিয়া আসিতে-

ছিলেন। মা নাই বলিয়া পাছে গৌরী কোন আব্দার রক্ষিত না হইলে মনোবেদনা অনুভব করে, এই আশঙ্কায় মাতুলানীকে অনেক সময় মাতার অধিক স্নেহযত্ন প্রদর্শন করিতে এবং গৌরীর অন্যায় আবদারও রক্ষা করিতে হইত। ইহার ফলে গৌরী একটু বেশী আবদারে, একটু বেশী প্রখরা হইয়া উঠিয়াছিল। ভয় বা সঙ্কোচ কাহাকে বলে, ইহা সে যেন জানিতই না।

রামজয় বোসের সঙ্গে দয়ারামের একটু দূর-আত্মীয় সম্পর্ক থাকায় উভয় পরিবারের মধ্যে যথেষ্ট ঘনিষ্ঠতা ও যাতায়াত ছিল। কুসুম মধ্যে মধ্যে গৌরীদের বাড়ীতে যাইত, গৌরীর মামীও কুসুমের কাছে আসিত। গৌরীর তো যাওয়া আসার ধরা-বাঁধা ছিল না, যখন ইচ্ছা হইত, তখনই বৌদির কাছে উপস্থিত হইত। গৌরী কুসুমকে বৌদি বলিত, এবং সেই সম্পর্কে উপেনকে উপীনদা বলিয়া ডাকিত।

এগারো বছরে পড়িলেই গৌরীর বিবাহের কথাবার্ত্তা চলিতেছিল। একদিন এই কথাপ্রসঙ্গে কুসুম গৌরীর সম্মুখেই তাহার মামীকে বলিয়াছিল, "এত খোঁজাখুজির দরকার কি মামী, উপেনের সঙ্গে গৌরীর বিয়ে দিয়ে দাও। কি বলিস্ গৌরী?"

গৌরী ঘাড় বাঁকাইয়া সলজ্জ হাস্যসহকারে বলিয়াছিল, "দূর!"

কুসুম জিজ্ঞাসা করিল, "দূর কেন, উপেন কি মন্দ বর?"

গৌরী লজ্জারক্ত মুখে উত্তর দিল, "ও যে উপীনদা।"

উপহাসের সহিত কুসুম বলিল, "হলোই বা দাদা। বেশ তো, দাদাকে নিয়ে ঘর করবি।"

চট্ করিয়া গৌরী উত্তর করিল, "বাবাকে দাদাকে নিয়ে ঘর করবো বল।"

প্রবীণার ন্যায় এই পাকা উত্তরে পরাজিত হইয়াও কুসুম হাসিয়া উঠিল।

তা উপেনের বিবাহ দিবার জন্য কুসুমের যে বিশেষ কিছু আগ্রহ ছিল, তাহা নহে। বরং দয়ারাম সময়ে সময়ে এ বিষয়ে একটু আগ্রহ প্রদর্শন করিয়া বলিত, "তাই তো, ছোঁড়াটা ডাগর হয়ে উঠেছে, ওর একটা বিয়ে দেওয়া দরকার হয়েছে।"

কুসুম ইহার অসম্মতি প্রকাশ করিরা উত্তর দিত, "হঁা, আপনি থাক্‌তে ঠাঁই পায় না, শঙ্করাকে ডাকে!" নিজে পরের ভাতে রয়েছে, বিয়ে দিলে তাকে খাওয়াবে কি?"

দয়া। খাওয়াবে কি ব'লে বিয়ে দেবে না?

কুসু। না। পরের মেয়ে একটা গলায় গেঁথে দিলেই হ'লো। ওর বিয়ের ভাবনার চাইতে তুমি গিরির বিয়ের ভাবনা ভাব দেখি।

দয়া। সে ভাবনা তো আছেই। তবে কি জান, লোকে বলবে, ছোঁড়াটাকে চাকরের মতন খাটিয়ে এক মুঠো ভাত দিচ্চে, কিন্তু ওর হিল্লে কিছু করলে না।

কুসুম রাগিয়া ঝঙ্কার দিয়া বলিত, "তা বলুক্। যার নিজের পেটের ভাত ক'রে খাবার ক্ষমতা নাই, সে চাকরের মত খেটে খাবে না তো কি করবে? ও পারে, নিজের হিল্লে নিজে করবে, না পারে, আইবুড়ো হয়ে থাকবে। তোমাকে ওর ভাবনা ভাবতে হবে না।"

স্ত্রীকে রাগিতে দেখিয়া দয়ারাম চুপ করিয়া যাইত।

তা দয়ারাম কুসুম অপেক্ষা উপেনকে বেশী ভালবাসিত বলিয়াই যে তাহার বিবাহ দিবার জন্য আগ্রহান্বিত ছিল, তাহা নহে, ইহাতে তাহার একটু স্বার্থসিদ্ধির আশা ছিল। উপেন তো সেই

পোষ্য হইয়া রহিয়াছে, এবং সম্ভবতঃ বরাবর থাকিবেও। বাপের ঘর-ভিটা নাই যে, সেখানে যাইবে, লেখাপড়াও এমন কিছু জানে না যে, চাকরী-বাকরী করিয়া নিজের আশ্রয় নিজে করিয়া লইবে। সুতরাং কুপোষ্যের ন্যায় তাহাকে প্রতিপালন করিতেই হইবে; স্ত্রীর ভাই—তাহাকে তো তাড়াইয়া দিতে পারিবে না। অথচ এই প্রতিপালনের বিনিময়ে তাহার নিকট হইতে আর্থিক বিষয়ে কিছু সাহায্যলাভের আশাও নাই। সাহায্যের মধ্যে গরু বাঁধা, বাজার করা, তামাক সাজা, ছেলেটা ধরা, এই পর্য্যন্ত। এ দিকে গিরির বিবাহে কিছু থোক টাকার দরকার। বড় কম টাকা নয়, ছয় সাত শত। ঝিঙেখালির উমেশ সরকার চারি শত নগদের কমে কিছুতেই রাজি হইবে না। কেনই বা রাজি হইবে? পাশ করা ছেলে, ঘর-ঘর সকলই পছন্দমত। নগদ চারি শত, আর দু'একখানা গহনা ও ঘরখরচেও কোন্ না আড়াই শত তিন শত পড়িবে। মোটের উপর সাত শত টাকা চাই।

এই সাত'শো টাকা ঘর হইতে বাহির করিতে গেলে টাকাগুলার সঙ্গে প্রাণটাও যে বাহির হইয়া যাইবে, এ কথা তো কুসুম বোঝে না; সে শুধু ভাল ঘর-বরের দাবী করিয়াই নিশ্চিন্ত। তা ভাল ঘর-বরই জুটিতে পারে, অথচ ঘর হইতে দুই এক শত টাকা বাহির করিলেই চলে, যদি পরেশ মিত্তিরের মেয়েটার সঙ্গে উপেনের বিবাহ দেওয়া যায়। মেনীর মা চার বিঘা জমি বেচিয়া নগদ ছয় শত টাকা দিতে প্রস্তুত। উহার এক শো খরচের অঙ্কে ধরিলে থোক্ পাঁচশো মজুদ থাকে। তাহা হইলে আর দুইশো টাকা বাহির করিলেই গিরির বিবাহ হইয়া যায়। কিন্তু কুসুম তো এত কথা বুঝে না; সে শুধু ওর বৌ কি খাইবে, এই ভাবনাতেই অস্থির।

তাহার কপালে যাহা আছে, তাহাই সে খাইবে, সে ভাবনা আমি এখন হইতে ভাবিতে যাই কেন? কিন্তু মেয়েমানুষের মাথায় এত বুদ্ধি তো আসে না! নাঃ, ইহাকেই বলে—'স্ত্রীবুদ্ধিঃ প্রলয়ঙ্করী।'

তা কুসুমের মাথায় বুদ্ধি যে ছিল না, তাহা নহে, এবং ঘর হইতে টাকা বাহির করা অপেক্ষা বাহিরের টাকায় মেয়ের বিবাহ সম্পন্ন হইবার পক্ষে তাহার আপত্তিও কিছুমাত্র ছিল না; শুধু আপত্তি ছিল, উপেনের এরূপ পরের ভাতে থাকায়। তাহার ভাই যে একমুঠা পেটের ভাতের জন্য পরের ঘরে চাকরের মত হীনভাবে থাকিয়া দিন কাটাইবে, ইহা কুসুমের তেমন ভাল লাগিত না। দয়ারাম তাহার স্বামী, কিন্তু উপেনের পর—কুটুম্ব ছাড়া আর কেহ নয়। কুটুমের ঘরে এমনভাবে বারমাস থাকা ভাল কি? দয়ারাম ইহাতে আপত্তি বা বিরক্তি প্রকাশ না করিলেও লোকের কাছে কুসুমের মাথা হেঁট হয় যে! আর দয়ারামও মুখে বিরক্তি প্রকাশ না করিলেও মনে মনে যে বেশ সন্তুষ্ট নহে, দয়ারামের কথায় বা কার্য্যে কুসুম এটুকু বেশ অনুভব করিয়া লইতে পারিত। হয় তো গাইটাকে খাবার দিতে বিলম্ব হইতেছে। দয়ারাম গম্ভীরভাবে নিজেই গিয়া বিচালি কাটিতে বসিত। কুসুম আসিয়া যদি জিজ্ঞাসা করিত, "তুমি আবার বিচালি কাটতে বসলে কেন?" তাহা হইলে দয়ারাম গম্ভীর মুখে উত্তর করিত, "বিচালি কেটে না দিলে গরুটা যে খেতে পায় না।"

কুসু। খেতে পায় না, উপনে এসে খেতে দেবে।

দয়া। তার ক্ষিদে না পেলে তো ঘরে ফিরবে না! ততক্ষণ গরুটা হাঁ ক'রে দাঁড়িয়ে থাকবে? উপেন যদি একদিন না পারে, আমার গরু—আমাকে খেতে দিতেই হবে। না দিলে আমারি ক্ষতি।

কথাটা বেশ সহজ স্বরে স্বভাবগম্ভীরভাবে বলিলেও কুসুম কিন্তু

এই সহজ স্বরের মধ্যেই ক্রোধের উগ্রতা বেশ দেখিতে পাইত; দেখিয়া নীরবে মাথা হেঁট করিয়া সরিয়া যাইত। তার পর উপেন যথাসময়ে ঘরে ফিরিলে কুসুম তাহাকে তিরস্কার করিয়া জিজ্ঞাসা করিত, "এতক্ষণ কোন্ চুলোয় ছিলি ?"

উপেন দিদির রাগটাকে উপেক্ষা করিয়া উত্তর দিত, "কোথায় থাকবো! রায়েদের ওখানে ব'সে তাস খেলা দেখছিলুম।"

ক্রোধে ভ্রূকুটী করিয়া কুসুম বলিল, "সেখানে ব'সে তাস্ খেলা দেখছিলি, কিন্তু এখানে তোর গরু দেখে কে ?"

সপ্রতিভভাবে উপেন বলিল, "বটে বটে, গরুর কথাটা মনেই ছিল না।"

বলিয়া সে ব্যস্তভাবে গরুকে খাবার দিতে যাইতেছিল, কুসুম তাহাকে ডাকিয়া রোষতীব্র কণ্ঠে বলিল, "তোমাকে আর কষ্ট কত্তে হবে না, গরুকে খাবার দেওয়া হয়েছে।"

উপে। কে খাবার দিলে ?

কুসু। যার গরু, সে-ই দিয়েছে। সে ছাড়া বাড়ীতে ক'টা চাকর-নফর আছে ?

শঙ্কিতভাবে উপেন বলিল,, "ঘোষজা মশাই খাবার দিয়েছেন ? তুমি বারণ করলে না কেন ?'

কুসুম বলিল, "গাইটা হাঁ ক'রে দাঁড়িয়ে থাকবে, আর আমি তাকে খাবার দিতে বারণ করবো ?"

উপেন মাথা চুলকাইতে চুলকাইতে জিজ্ঞাসা করিল, "বড্ড ভুল হয়ে গিয়েছে বটে। ঘোষজা মশাই কিছু বল্লেন না কি ?

তীব্রস্বরে কুসুম বলিল, "এ বেলা তোমাকে বেশী ক'রে একথালা ভাত বেড়ে দিতে বল্লে।"

উপেন এবার ঈষৎ হাসিল ; বলিল, "এটা দিদি, তোমার মনগড়া কথা। ঘোষজা মশাই এমন কথা বলবেন না।"

ঘোষজা মশায়ের প্রতি তাহার এই অতিরিক্ত শ্রদ্ধা দর্শনে কুসুম বিরক্ত হইয়া বলিল, "বলেন না ব'লেই তোর আস্পর্দ্ধা এত বেড়ে গিয়েছে। কিন্তু তোর এ কাজ কি ভাল হয়েছে?"

কাজটা যে ভাল হয় নাই, ইহা উপেনও মনে মনে বেশ বুঝিয়া ছিল ; সুতরাং সে দিদির তিরস্কারের কোন উত্তর দিতে পারিত না। শুধু শঙ্কিতভাবে ঘোজা মহাশয়ের গম্ভীর দৃষ্টি এড়াইয়া চলিতে চেষ্টা করিত।

কোন দিন বা দয়ারাম পরিশ্রান্ত হইয়া ধূমপানের অভিপ্রায়ে তামাক সাজিয়া দিবার জন্য উপেনকে ডাকিলেন। কিন্তু তাহার সাড়া না পাইয়া গম্ভীরভাবে কুসুমকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "উপেন বাবু গেলেন কোথায়?"

কুসুম উত্তর দিল, "কি জানি, এই যে বসেছিল।"

গম্ভীর মুখে দয়ারাম বলিল, "কিন্তু দরকারের সময় চ'লে গিয়েছে।"

বলিয়া সে মুখে একটা তীব্র বিরক্তির ভাব আনিয়া নিজে যখন তামাক সাজিতে বসিত, তখন তাহার সেই বিরক্তি-কুঞ্চিত মুখের দিকে দৃষ্টি পড়িলে কুসুম লজ্জায় যেন মরমে মরিয়া যাইত ; তাহার মনে হইত, হতভাগা উপেনকে এখান হ'তে তাড়িয়ে তবে আমার অন্য কাজ।"

কিন্তু তাড়াইবার উপায়ও ছিল না। কথাপ্রসঙ্গে সে যদি কখন দয়ারামের কাছে বলিত, "উপ্‌নে মিছে ব'সে ব'সে অন্ন ধ্বংস করে কেন? তার চাইতে ও চ'লে গিয়ে নিজের পেটের ভাত নিজে ক'রে খাক্।"

তাহা হইলে দয়ারাম দুঃখীতভাবে উত্তর করিত, "তা যেতে পারে যাক্, কিন্তু আমি ওকে তোমার ভাই ব'লে মনে করি না কুসুম, নিজের ভাই মনে ক'রেই সময়ে সময়ে রাগের মাথায় দু'এক কথা ব'লে ফেলি। তাতে যদি তোমার রাগ হয়—"

বাধা দিয়া কুসুম অপ্রতিভভাবে বলিত, "না না, আমি তো রাগের কথা বলছি না; ও ছোঁড়া যে ব'সে ব'সে কুড়ে হয়ে গেল।"

গম্ভীরভাবে মস্তক সঞ্চালন পূর্ব্বক দয়ারাম বলিত, "ও ব'সে আছেই বা কোন্‌খানটায়? সংসারের কোন্ কাজটা ওর দ্বারায় না হচ্ছে? গরু-বাছুর দেখা, হাটবাজার, দোকান, সকল কাজই তো উপেন কচ্চে। সত্যি বলতে গেলে কুড়ে হয়ে যাচ্চি বরং আমি। এক ছিলিম তামাক সেজে খেতে হলে ওকে ডাকতে হয়।"

উপেনের উপর এই স্নেহসূচক উক্তির উত্তরে কুসুম আর কিছু বলিতে পারিত না। দয়ারাম তাহাকে উপদেশ দিয়া বলিত, "তোমার সাতটা নয়, পাঁচটা নয়, একটা ভাই, ও বাঁচলে তোমার বাপের বংশরক্ষা হবে। এখন ওর যদি ভাল চাও, তবে ওকে ফাঁকে ছেড়ে দিও না। ওকে কাছে রেখে মানুষ ক'রে বিয়ে-থা দিয়ে সংসারী ক'রে দাও।"

অগত্যা কুসুম উপেনকে তাড়াইবার ইচ্ছাকে মনে স্থান দিতে পারত না। দয়ারামও দুই বেলা দুই মুঠা ভাতের পরিবর্ত্তে উপেনের দ্বারা একটা পাঁচ টাকার মাহিনার চাকরের কাজ পাওয়াকে ক্ষতিজনক মনে করিত না।

—৪—

"উপেন !"

"কেন দিদি ?"

"বিয়ে করবি ?"

"হুঁ। তুমি বিয়ে দেবে না কি ?"

সহাস্যে কুসুম বলিল, "আমি দিতে যাব কেন ? যে দেবার মালিক সেই দেবে।"

উপেন জিজ্ঞাসা করিল, "কে, ঘোষজা মশাই ?"

"হাঁ।"

"বেশ তো, আমারো বিয়ে কত্তে সাধ হয়।"

"সাধ তো হয়, কিন্তু বিয়ে করা কি অমনি মুখের কথা ?"

"তবে কি ওটা দাঁতের কথা দিদি ?"

"দেঁতো কথাও নয়। অনেক দিক্ ভেবে তবে বিয়ে করতে হয়।"

"কোন্ কোন্ দিক্ ভাবতে হয়, শুনি।"

"যাকে বিয়ে করবি, তাকে খাওয়াবি কি ?"

"আমি যা খাচ্চি, সেও তাই খাবে।"

"তুই তো তোর ঘোষজা মশায়ের ভাত খাচ্চিস।"

"তাকেও ঘোষজা মশায়ের ভাত খেতে হবে।"

ঈষৎ হাসিয়া কুসুম বলিল, "কিন্তু সে তো তোর মত গরু বাঁধতে, তামাক সাজতে, বাজারে যেতে পারবে না ?"

মাথা নাড়িয়া উপেন বলিল, "ঘর ঝাঁট দিতে, বাসন মাজতে, রাঁধতে বাড়তে পারবে তো ?"

সহাস্য মুখে কুসুম বলিল, "তা হ'লে সে তোর ঘোষজা মশায়ের ঘরে চাকরাণী হয়ে থাকবে বল্।"

উপেন বলিল, "থাকলেই বা। চাকরের স্ত্রী চাকরাণীই হয়, রাজরাণী হয় না।"

উপেনের কথায় কুসুম হাসিয়া উঠিল; বলিল, "মন্দ যুক্তি নয়। কিন্তু তোর ঘোষজা মশায়ের যেমন চাকরের দরকার, আমার যদি তেমন চাকরাণীর দরকার না থাকে?"

উপে। দরকার না থাকে, বসিয়ে বসিয়ে খাওয়াবে।

কুসু। বয়ে গেছে আমার খাওয়াতে। আমি কেন শুধু শুধু তাকে খাওয়াতে যাবো?

উপে। তবে 'উপেন, বিয়ে করবি' বল্‌তে এসেছ কেন?

কুসু। বিয়ে কত্তে বল্লেই বুঝি খেতে দিতে হয়? তুই আর একটা মেয়েমানুষকে খাওয়াতে পারবি না?

মাথা নাড়িয়া উপেন উত্তর করিল, "উহুঁ।"

ঈষৎ রাগতভাবে কুসুম বলিল, "তবে তোর বিয়ে ক'রেও কাজ নাই।"

হাসিতে হাসিতে উপেন বলিল, "এর চাইতে ভাল কথাও আর কিছুই নাই দিদি।"

ক্রোধে ভ্রূকুটী করিয়া কুসুম বলিল, "ভাল কথা বৈ কি। বিয়ে করবি না, বাপের বংশলোপ হবে, বাপ-পিতামহের নাম ডুবে যাবে, এর চাইতে ভালকথা আর আছে কি?"

দিদির রাগকে উপেক্ষার হাসিতে উড়াইয়া দিয়া উপেন বলিল, "বাপ-পিতামহের নাম অনেক দিন ডুবে গিয়েছে দিদি, যে দিন থেকে গোপাল রায়ের ছেলে নাম ডুবে গিয়ে দয়ারাম ঘোষের শালা নাম পেয়েছি।"

রোষক্ষুব্ধ-কণ্ঠে কুসুম বলিল, "তবু তো বোনায়ের ভাত খেয়ে প'ড়ে আছিস্।"

উপেন বলিল, "না থেকে কি করবো দিদি? শা—অধিকারীর ভাতের চেয়ে এ ভাত অনেক মিষ্টি!"

রাগে তর্জ্জন করিয়া কুসুম বলিল, "তোর মিষ্টি ভাতে ছাই পড়ুক! দেখ উপেন, তুই নির্ভাবনার ভাত খেয়ে খেয়ে একেবারে অধঃপাতে গিয়েছিস্।"

মাথা চুলকাইয়া উপেন বলিল, "তুমি আজ বড্ডই রেগে উঠেছ দিদি। রাগ হ'লে তোমার জ্ঞান থাকে না।"

ক্রোধকম্পিত-কণ্ঠে কুসুম বলিল, "আমার জ্ঞান খুব আছে উপ্‌নে, তোরি জ্ঞান বুদ্ধি সব লোপ পেয়েছে। তাই তুই—"

"তাই আজ উপেন্দ্রনাথ তোমার মনোমত বাজার আন্‌তে পারে নি, কুসুম?"

দয়ারামকে দেখিয়া কুসুম তাড়াতাড়ি কাঁধের আঁচলটা মাথায় তুলিয়া দিল, এবং ক্রোধে ভ্রূভঙ্গী করিয়া বলিল, "হাঁ, আমার ছাদ্দ ভাল রকমে কত্তে পারে নি। দেখ, তুমিই আস্কারা দিয়ে ওকে মাথায় তুলেছ।"

ঈষৎ হাস্য সহকারে দয়ারাম বলিল, "কিন্তু তুমি তো দিন রাত তর্জ্জন-গর্জ্জন ক'রে ওকে পায়ে নামাবার চেষ্টায় আছ, তবে আর ভয় কি কুসুম! ও বেচারী কোনকালেই মাথায় উঠতে পারবে না, পায়েও নামবে না, ত্রিশঙ্কুর মত যেখানকার মানুষ, সেইখানেই থেকে যাবে। কি বল হে উপেন্দ্রনাথ?"

বলিয়া দয়ারাম উচ্চ হাসি হাসিয়া উঠিল। উপেনও নতমস্তকে দাঁড়াইয়া মৃদুমন্দ হাসিতে লাগিল। তাহাদিগকে হাসিতে দেখিয়া কুসুম আরও রাগিয়া উঠিল; রাগে হাত-মুখ নাড়িয়া বলিল, "হাঁ,

আমি ওকে রাতদিনই গাল-বকুনি দিচ্চি, তুমি দেখতে পাচ্ছো। ও আমার বড্ড পর কি না, আমার সতাতো ভাই যে।”

কুসুমকে আরও বেশী রাগাইবার অভিপ্রায়ে দয়ারাম হাসিতে হাসিতে বলিল, “আপন ভাই হয়েই এই, সতাতো ভাই হ’লে কি যে হ’তো—”

তর্জ্জন সহকারে কুসুম বলিল, “হাঁ, হ’তো, মারামারি কাটাকাটি হ’তো! আমার ভাইকে আমি যা খুসী তাই বলবো, তোমার তাতে কি বল তো?”

মুখখানাকে একটু গম্ভীর করিয়া দয়ারাম বলিল, “আমার কিছুই নয়, তবে লোকে বলে কি জান, ওদের বৌটা পাড়া-কুঁদুলী; নিজের ভাইকেই যা মুখে আসে, তাই বলে।

রাগে মুখ লাল করিয়া ক্রোধরুদ্ধস্বরে কুসুম বলিল, “হাঁ, বলে। বেশ করবো, বলবো, লোকের তাতে এত মাথাব্যথা কিসের? তারা ভায়ের দোষ দেখতে পায় না?”

হাসি চাপিয়া দয়ারাম বলিল, “তা আর কৈ দেখতে পায় কুসুম, তারা তোমারি শুধু নিন্দে করে।”

কুসুম বলিল, “করুক আমার নিন্দে, তাতে তোমার কি?”

সহাস্যে দয়ারাম বলিল, “আমার কি, তবে তোমার নিন্দে শুনলে আমার একটু কষ্ট হয়। কি বল হে উপেন, কষ্ট হয় না কি?

উপেন উত্তর করিল, “তা হয় বৈ কি ঘোষজা মশাই।”

মুখভঙ্গী সহকারে কুসুম বলিল “আহা হা, তোর ঘোষজা মশায়ের কষ্ট হোক্ না হোক্, তোর খুবই কষ্ট হয় বটে। দেখ উপ্‌নে, আমার কষ্ট তুই যদি বুঝতে পারতিস্, তা হ’লে আজ আমার ভাবনা কি?”

মস্তকসঞ্চালন সহকারে দয়ারাম বলিল, “সে কথা সত্যি উপেন।

তুমি যদি তোমার দিদির কষ্ট বুঝে চল্‌তে, তা হ'লে আজ তোমা দিদির কোটা-বালাখানা না হয়েই থাকতো না। কিন্তু তুমি তো তা পার্‌লে না, কাজেই এখন যা পারবে—তামাক এক ছিলিম তৈরী কর দেখি।”

উপেন তামাক সাজিতে চলিয়া গেল। দয়ারাম তখন কুসুমকে সম্বোধন করিয়া বলিল, “আজ এমন উগ্রচণ্ডা মূর্ত্তিতে উপেনের ওপর পড়েছিলে কেন? ও বেচারী করেছে কি?”

ঝঙ্কার দিয়া কুসুম বলিল, “করেছে আমার মাথা আর মুণ্ডু! ও হতভাগা আবার আমার করবে কি? বোনায়ের অন্নদাস হয়ে প'ড়ে রয়েছে—ক্ষ্যামতা তো এই।”

সন্ত্রস্তভাবে দয়ারাম বলিয়া উঠিল, “ছি কুসুম, এমন সব কথা বল্‌তে আছে? শুনলে ওর মনে কত কষ্ট হবে।”

ক্রোধগম্ভীর স্বরে কুসুম বলিল, “কষ্ট হবে না ছাই হবে। ওর মনে আবার দুখ্যু কষ্ট ঘেন্না লজ্জা আছে না কি?”

স্থিরগম্ভীর কণ্ঠে দয়ারাম বলিল, “সব আছে কুসুম, সব আছে। আমার এক মুঠো ভাত খাচ্চে ব'লে ওর লজ্জা-ঘেন্না চ'লে যায় নি।”

কুসুম নীরবে দাঁড়াইয়া রাগে যেন ফুলিতে লাগিল! দয়ারাম তাহাকে সান্ত্বনা দিয়া বলিল, “আচ্ছা কুসুম, উপেন কি শুধু আমার ভাতেই আছে? আমার ভাতে আমার যেমন অধিকার, তোমারো তেমনি অধিকার নাই কি? সে অধিকার যখন তোমার আছে, তখন তোমার ভাত তোমার ভাই খাবে, তাতে ওর অপমান কিসের?”

গর্জ্জন সহকারে কুসুম বলিল, “না, অপমান আর কিসের, চার পো মান! ব্যাটাছেলে, হাত-পা রয়েছে, ও কেনই বা ব'সে ব'সে বোনের ভাত খাবে?”

দয়ারাম ইহার উত্তর দিতে যাইতেছিল, এমন সময় উপেন আসিয়া তাহার হাতে হুঁকা দিয়া বলিল, "আপনি তামাক খান ঘোষজা মশাই। দিদি আজ বড্ডই রেগে উঠেছে, বোঝালেও বুঝবে না। মিছে কেন নিজেও বক্‌বেন, দিদিকেও বকাবেন ?"

বলিয়া সে একবার দিদির ক্রোধগম্ভীর মুখের দিকে চাহিল এবং দিদির এই রাগটাকে সে যেন আদৌ গ্রাহ্য করে না, এমনই মুখের ভাব দেখাইয়া ধীরে ধীরে বাহির হইয়া গেল। দয়ারাম পত্নীকে সম্বোধন করিয়া বলিল, "দেখলে, নেহাৎ গোবেচারী, মনে একটুও রাগ নাই। এর ওপরেও তোমার রাগ হয় ?"

রোষস্ফীত কণ্ঠে কুসুম বলিল, "হাঁ হয়—রাগ নাই ব'লেই তো এর ওপর বেশী রাগ হয়। তা নইলে সাতটা নয়, পাঁচটা নয়, একটা ভাই, এক মুঠো ভাতের তরে কি ওকে এমন সব কথা—"

কুসুম কথা শেষ করিতে পারিল না, চোখ দিয়া দুই বিন্দু অশ্রু গড়াইয়া পড়িল। আঁচলে চোখ মুছিতে মুছিতে সে তাড়াতাড়ি সেখান হইতে সরিয়া গেল। দয়ারাম বসিয়া গম্ভীরভাবে হুঁকায় টান দিতে লাগিল।



"এখানে ব'সে কেন উপীনদা ?"

বোসেদের প'ড়ো বাগানের ভিতর জঙ্গলভরা পুকুরের পাড়ে একটা বড় আমগাছের শিকড়ের উপর গাছের কাণ্ড ঠেস্ দিয়া উপেন চুপ করিয়া বসিয়াছিল। পুকুরের জল শৈবালদলে ও পানায় ঢাকিয়া গিয়াছিল, শুধু মাঝখানে খানিকটা ফাঁকা জায়গায় কালো জল সূর্য্যকিরণে চক্ চক্ করিতেছিল। একটা পানকৌড়ী সেইখানে ডুব দিয়া

আহারের অন্বেষণ করিতেছিল। কয়েকটা কাদাখোঁচা অব্যক্ত শব্দ করিতে করিতে পুকুরের ধারে ধারে চরিয়া বেড়াইতেছিল। উপেন চুপ করিয়া বসিয়া পাখীগুলার স্বচ্ছন্দ বিচরণ লক্ষ্য করিতেছিল।

এমন সময় গৌরী সম্মুখে আসিয়া জিজ্ঞাসা করিল, "এখানে ব'সে কেন উপীনদা?"

উপেন দৃষ্টি না ফিরাইয়াই যেন নিতান্ত উপেক্ষার স্বরে উত্তর দিল, "ব'সে আছি।"

গৌরী কিছুক্ষণ উপেনের মুখের দিকে চাহিয়া চাহিয়া বলিল, "তোমার মনটা যেন ভার ভার।"

কুঞ্চিত মুখে উপেন উত্তর করিল, "হুঁ।"

তাহার দিকে আর একটু সরিয়া আসিয়া গৌরী জিজ্ঞাসা করিল, "কেন উপীনদা, কি হয়েছে?"

"কিছুই না।"

"তবে?"

উপেন একটা ইটের টুক্‌রা লইয়া শিকড়ের গায়ে ঠুকিতে ঠুকিতে গম্ভীরমুখে জিজ্ঞাসা করিল, "তোরও মা নাই, না গৌরী?"

গৌরী বলিল, "না, আমার মামী আছে।"

"তা বটে" বলিয়া উপেন ইটের টুক্‌রাটা পুকুরের দিকে ছুড়িয়া দিল। কাদাখোঁচাগুলা ভয় পাইয়া উড়িয়া খানিক দূরে গিয়া বসিল

গৌরী বলিল, "কেন, তোমারও তো দিদি আছে, উপীনদা?"

ভ্রূ কুঞ্চিত করিয়া উপেন উত্তর করিল, "তা আছে।"

গৌরী বলিল, "কেন, দিদি কি তোমায় ভালবাসে না?"

উপেন বলিল, "বাসে বৈ কি।"

মৃদু হাসিয়া গৌরী বলিল, "তবে তোমার এত দুখ্যু কেন?"

চমকিত দৃষ্টিতে গৌরীর মুখের দিকে চাহিয়া রুক্ষকণ্ঠে উপেন জিজ্ঞাসা করিল, "দুখ্যুটা আমার কিসের দেখলি তুই ?"

গৌরী সহাস্যমুখেই উত্তর দিল, "কিসের দুখ্যু, তা কেমন ক'রে জানবো বল। মোদ্দা দুখ্যু একটু হয়েছে তোমার।"

"কে বল্‌লে তোকে দুখ্যু হ'য়েছে ?"

ঘাড় দোলাইয়া গৌরী বলিল, "কে বলবে আবার? আমি বুঝতে পেরেছি।"

ভ্রূকুটী করিয়া উপেন বলিল, "খুব বুদ্ধি তোর দেখছি! তুই এখানে কেন এসেছিস্ ?"

গৌরী। আমি বেলপাতা তুল্‌তে এসেছি।

উপেন। বেলপাতা কি হবে ?

গৌরী। শিবপূজো হবে।

উপেন। কে শিবপূজো করবে? তুই ?

সলজ্জ হাস্যসহকারে গৌরী বলিল, "দূর, আমি শিবপূজো কত্তে যাব কেন? মামীমা করবে ?"

সহাস্যে উপেন বলিল, "ওঃ, আমি ভেবেছিলাম, ভাল বর পাবার তরে তুই শিবপূজো করবি।"

লজ্জারক্ত মুখে গৌরী বলিল, "ইঃ, আমি শিব পূজো করবো! আমি শুধু বোশেখ মাসে শিবপূজো করি।"

"শিবের মন্ত্র জানিস্ তুই ?"

"হুঁঃ।"

"কৈ, বল্ দেখি।"

"পুকুরপাড়ে দাঁড়িয়ে বুঝি মন্ত্র বলে? তুমি কি উপীনদা ?"

"আমি উপীনদা।"

"আর—"

"আর কি ?"

"আর মেনীর বর।"

"বেরো আবাগী" বলিয়া উপেন তাহাকে মারিবার জন্য উঠিতে উদ্যত হইলে গৌরী খিল্ খিল্ করিয়া হাসিতে হাসিতে একদিকে ছুটিয়া পলাইল। উপেন পুনরায় বৃক্ষকাণ্ডে ঠেস্ দিয়া বসিল। সূর্য্য তখন অনেকটা উপরে উঠিয়াছিল। গাছের পাতার ফাঁক দিয়া খানিকটা রোদ আসিয়া মাথার উপর পড়িল। গাছের ডালে বসিয়া একটা ঘুঘু উচ্চকণ্ঠে কাহাকে ডাকিতেছিল; যাহাকে ডাকিতেছিল, সে বুঝি বাগানের অপর প্রান্ত হইতে থাকিয়া থাকিয়া তাহার আকুল আহ্বানের প্রতিধ্বনিরূপে উত্তর দিতেছিল। উপেন হাত দুইটা গাছের গায়ে রাখিয়া তাহার উপর মস্তক স্থাপন করিয়া নীরবে বসিয়া রহিল। বসিয়া বসিয়া যাত্রার দলের অধিকারীর রূঢ় কথাগুলা হইতে দিদির কথার রূঢ়তা কত বেশী, তাহাই ভাবিয়া স্থির করিতে লাগিল।

পাখীটা ডাকিয়া ডাকিয়া শ্রান্ত হইয়া নীরব হইল, গৌরী বেলপাতা তুলিয়া চলিয়া গেল, রোদটা ক্রমে চড়া হইয়া মাথা হইতে মুখে বুকে আসিয়া পড়িল। তখনও সেই একই ভাবে বসিয়া উপেন দিদির কড়া কথাগুলার মধ্যে স্নেহের কতটুকু আভাস আছে তাহাই খুঁজিয়া বেড়াইতে লাগিল।

কিন্তু বহুক্ষণের অনুসন্ধানেও সে যখন স্নেহের বিন্দুমাত্র কোমলতা খুঁজিয়া পাইল না, বরং দিদির প্রত্যেক উক্তিই অক্ষম অন্নদাসের প্রতি তীব্র তিরস্কাররূপে তাহার চিত্তে নিদারুণ দুঃখের বেদনা জানাইয়া দিতে লাগিল, তখন সে নিতান্ত বিরক্তভাবে উঠিয়া গৃহাভিমুখে অগ্রসর হইল।

যে রাস্তা দিয়া উপেন যাইতেছিল, সেই রাস্তার ধারেই মেনীদের বাড়ী। উপেন যখন মেনীদের বাড়ীর দরজার সম্মুখবর্ত্তী হইয়াছে, তখন হঠাৎ মেনী মুখে খুব একটা শঙ্কাজনিত ব্যাকুলতার ভাব লইয়া ছুটিয়া বাড়ীর বাহির হইল, এবং বাহির হইয়াই উপেনকে সম্মুখে দেখিয়া থমকিয়া দাঁড়াইল। উপেনও তাহার ভাবভঙ্গী দেখিয়া আশ্চর্য্যান্বিতভাবে দাঁড়াইয়া পড়িল। দাঁড়াইবামাত্র মেনী ব্যাকুল-নেত্রে তাহার মুখের দিকে চাহিয়া শঙ্কাকম্পিত কণ্ঠে বলিয়া উঠিল, "একবার আমাদের বাড়ীতে আস্‌বে না?"

কৌতূহলান্বিতভাবে উপেন জিজ্ঞাসা করিল, "কেন, কি হয়েছে?"

"ওগো, আমার মা কেমন কচ্চে। একবার এস না গা!"

বলিয়াই মেনী উপেনের একখান হাত ধরিয়া ফেলিল। তাহার কথাগুলার মধ্যে এতটা কাতরটা ছিল যে, তাহাতে উপেন মেনীর এই স্পর্দ্ধার জন্য কিছুমাত্র বিরক্ত হইতে বা যাইতে অস্বীকার করিতে পারিল না। সে মেনীর পশ্চাৎ পশ্চাৎ একপ্রকার ছুটিয়াই বাটীর মধ্যে প্রবিষ্ট হইল। গিয়া দেখিল, মেনীর মা জ্বরে বেহুঁস হইয়া পড়িয়া রহিয়াছেন; ডাকিলে সাড়া পর্য্যন্ত পাওয়া যায় না। দেখিয়া উপেন মেনীকে জিজ্ঞাসা করিল, "কদ্দিন জ্বর হয়েছে?"

"আজ তিন চার দিন।"

"ডাক্তার দেখান হচ্চে?"

"না।"

"কেন হয় নি?"

"মা বলে, ডাক্তারকে টাকা দিতে হবে, টাকা কোথায় পাব?"

উপেন একটু ভাবিয়া বলিল, "আচ্ছা, আমি এক্ষুণি ডাক্তার নিয়ে আসছি।"

বলিয়াই সে দ্রুতপদে বাহির হইয়া গেল, এবং অল্পক্ষণ পরেই ডাক্তার সঙ্গে পুনরায় উপস্থিত হইল।

ডাক্তার রোগী দেখিয়া বলিলেন, "ভয় নাই, ম্যালেরিয়া জ্বর, শিশি দুই তিন মিক্শ্চার খেলেই সেরে যাবে।"

কিন্তু ঔষধের দাম,—ভিজিটের টাকা? উপেন একটু ইতস্ততঃ করিয়া বলিল, "ওষুধ দিন ডাক্তারবাবু; আমি আপনার সব টাকা মিটিয়ে দেব।"

উপেনের টাকা দিবার ক্ষমতা কত দূর, তাহা জানিতে ডাক্তারের বাকী ছিল না; তথাপি ভদ্রতার অনুরোধে তাঁহাকে স্বীকৃত হইতে ও ঔষধ দিতে হইল। উপেন ঔষধ আনিয়া দিয়া আহারাদির জন্য প্রস্থান করিল।



"রান্না হ'য়েছে দিদি, ভাত দেবে?"

"হাঁ দেব, খেতে ব'স না। সকাল থেকে কত কাজ ক'রে এলে, তাড়াতাড়ি খেতে না দিলে ভাল দেখায় কি?"

দিদির রূঢ় উত্তর শ্রবণে শঙ্কিতভাবে ঘাড়ে হাত বুলাইতে বুলাইতে উপেন বলিল, "কাজ আর আমি কি কচ্চি দিদি? কাজ না করলেও তো খেতে দিয়ে আসছো।"

ঝঙ্কার দিয়া কুসুম বলিল, "ঝক্‌মারি করেছি; আমিই তো এই ক'রে তোর আস্পর্দ্ধা বাড়িয়ে দিয়েছি।"

যেন একটু ভয়ে ভয়ে উপেন জিজ্ঞাসা করিল, "কেন কি হয়েছে দিদি?"

তর্জ্জন সহকারে কুসুম বলিল, "হয়েছে আমার মাথা মুণ্ডু ছাদ্দ পিণ্ডি। আর কিছু বাকী আছে?"

দিদির রাগের প্রকৃত কারণ বুঝিতে না পারিয়া উপেন চুপ করিয়া দাঁড়াইয়া রহিল। অদূরে গিরি ছোট খোকাকে লইয়া খেলা করিতেছিল। সে জিজ্ঞাসা করিল, "তুমি এতক্ষণ কোথায় ছিলে মামা?"

উপেন একটু ইতস্ততঃ করিয়া উত্তর দিল, "কোথায় থাকবো আবার? এই ছিলুম—"

গিরি বলিল, "কোথায় ছিলে? আমি তো ডেকে ডেকে হাল্লাক্ হ'য়ে গেলুম। মা রান্না চাপিয়ে ব'সে,—কে দোকান যায়, তার ঠিক নাই। বাবা এতক্ষণে এসে—"

ব্যস্ততা সহকারে উপেন বলিয়া উঠিল, "এঁ্যা, ঘোষজা মশাই দোকানে গেলেন?"

গিরি বলিল, "যাবে না তো কি করবে? নুণ না আন্‌লে তো রান্না হবে না।"

তর্জ্জন সহকারে কুসুম বলিল, "তুই বক্‌ছিস্ কেন গিরি? রান্না না হ'লে ওর তো বড়ই ক্ষতি! ওর জগন্নাথের আট্‌কে বাঁধা রয়েছে, আসবে আর খাবে।"

ক্ষুণ্ণ স্বরে উপেন বলিল, "তা আমি কি করবো? আমাকে তো বল্‌লেই হ'তো, দোকানে যেতে হবে।"

কুসুম বলিল, "পাড়ায় পাড়ায় ঘুরে তোমাকে বল্‌তে ভুলে গিয়েছি। তোমার যে আপিসের চাকরী রয়েছে, তা তো আমি জানি না।"

কুণ্ঠিতভাবে উপেন বলিল, "চাকরী নয় দিদি, মেনীর ম'ার বড্ড অসুখ—"

বাধা দিয়া কুসুম বলিল, "মেনীর মার অসুখ, তাতে তোর কি বল্‌তো? দিদি ম'রে প'ড়ে থাকলেও ফিরে চেয়ে দেখিস্ না, আর মেনীর মা'র অসুকে তোর এত মাথা ব্যাথা হ'লো কেন?"

ঈষৎ হাসিয়া উপেন বলিল, "তোমার অসুখে তোমাকে দেখ্‌বার লোক আছে দিদি, কিন্তু ওদের যে কেউ দেখ্‌তে নাই।"

ক্রুদ্ধভাবে কুসুম বলিল, "তাই তুই ছুটে দেখতে গিয়েছিলি। গিয়ে করলি কি?"

উপেন বলিল, "ডাক্তার ডেকে এনে ওষুধের বন্দোবস্ত করে দিয়ে এলাম।"

কুসুম বলিল, "বলিস্ কি, এত কাজ ক'রে এলি? তুই তো তা হ'লে মস্ত কাজের লোক হয়ে উঠলি দেখ্‌ছি।"

সহাস্যে উপেন বলিল, "কেন দিদি, তুমি কি আমাকে এতই অকেজো মনে কর?"

গিরি বলিল, "হাঁ মামা, মেনীর মা'র জন্যে এত খেটে এলে কেন? মেনীর মা কি তোমার শাশুড়ী?"

উপেন। তুই থাক্‌তে আর কেউ আমার শাশুড়ী হ'তে পারে গিরি?"

ঘাড় দোলাইয়া গিরি বলিল, "হুঁ, পারে না বৈ কি। আমি তো তোমার মিথ্যের শাশুড়ী, কিন্তু মেনীর মা সত্যিকার শাশুড়ী হবে।"

হাসিতে হাসিতে উপেন বলিল, "তা হয় হবে।"

গিরি বলিল, "হবে নয়, সত্যিই হবে। আমি কিন্তু মামা, মেনীকে মামী বলতে পারবো না।"

কুসুম জিজ্ঞাসা করিল, "কি বল্‌বি তবে?"

গিরি বলিল, "কালী ঠাকরুণ বলবো। তাতে কিন্তু মামা তুমি রাগ কত্তে পারবে না।"

মেয়েকে তিরস্কার করিয়া কুসুম বলিল, "না, রাগ করবে কেন? কালী ঠাকরুণ না ব'লে পেত্নী ঠাকরুণ বলবি, আরো ভালো শোনাবে। আহা, তবু যদি মেয়ের নিজের রূপ থাকতো।"

উপেন বলিল, "কেন দিদি, গিরির রূপের অভাব তুমি কোন্ খানটায় দেখলে?"

কুসুম বলিল, "কোন্খানটায় নয়? কি রূপসী মেয়ে। তাই আজ এক বছর খুঁজেও বর পাওয়া যাচ্চে না।"

উপেন। সেটা মেয়ের রূপের অভাবে নয় দিদি, পয়সার অভাবে। পয়সা থাকলে পেত্নীর মত মেয়েরও একদিনে বর জুটে যায়।

কুসুম! হুঁ, তা আর জুটতে হয় না। আচ্ছা, কিছু পয়সা পেলে তুই মেনীকে বিয়ে কত্তে পারিস্?

উপেন। হাজারখানেক টাকা পেলে খুব পারি।

কুসুম। বলিস্ কি রে উপেন?

উপেন। কি আর মন্দ বলছি। কথাতেই আছে, কড়ির কাছে বুড়োর বিয়ে!

কুসুম। তা হলেও ওরকম কালো-কুচ্ছিত মেয়ে!

উপেন। টাকা তো কালো কুচ্ছিত নয় দিদি!

কুসুম। তা হ'লে তুই টাকাকেই বিয়ে করবি বল্।

উপেন। তা নয় তো কি?

গিরি জিজ্ঞাসা করিল, আচ্ছা মামা, হাজার টাকা নিয়ে তুমি কি করবে?"

উপেন বলিল, "একটা কারবার করবো।"

গিরি। আমাকে কিছু দেবে না?

উপেন। তোকে? তোকে একটা গয়না গড়িয়ে দেব।

গিরি। কি গয়না দেবে?

উপেন। তুই যা চাইবি।

গিরি। আমি যা চাইবো, তাই দেবে?

উপেন। হুঁ।

একটু ভাবিয়া গিরি বলিল, "আমাকে এক ছড়া গিনির মালা দিতে হবে।"

উপেন বলিল, "গিনির মালা—আচ্ছা, তাই দেব।"

কুসুম হাসিয়া বলিল, "তবে আর কি, মেনীর সঙ্গে উপেনের বিয়ে হয়ে গেল, উপেন হাজার টাকা পেলে, আর তোকেও এক ছড়া গিনির মালা গড়িয়ে দিলে। আর ভাবনা কি? এখন তুই উঠে খোকাকে দুধ খাইয়ে দে, আর উপেনও নেয়ে আয়!"

রাগের সহিত যে কথাবার্ত্তা আরব্ধ হইয়াছিল, হাসিতে তাহার সমাপ্তি হইল দেখিয়া উপেন আনন্দে স্নান করিতে গেল। গিরিও উঠিয়া খোকাকে দুধ খাওয়াইতে চলিল।



"এক, দুই, তিন।"

রাশীকৃত বকুলফুল কুড়াইয়া বকুলগাছের ছায়ায় বসিয়া গৌরী মালা গাঁথিতেছিল, আর এক একবার মুখ ফিরাইয়া আগ্রহ-চঞ্চল নেত্রে পার্শ্ববর্ত্তী পথের দিকে চাহিয়া দেখিতেছিল। কিন্তু যাহার আগমন প্রতীক্ষা করিতেছিল, সে আসিতেছিল না; সুতরাং বিরক্ত-ভাবে মুখ ফিরাইয়া লইয়া পুনরায় মাল্যগ্রন্থনে মনোনিবেশ করিতেছিল।

প্রভাতের সোনালী রৌদ্র পত্রান্তরাল ভেদ করিয়া, তাহার মুখের উপর পড়িয়া মুখখানাকে সূর্য্যালোকস্পৃষ্ট পদ্মটির মত উজ্জ্বল করিয়া তুলিয়াছিল; মৃদুবাতাসে বৃন্তচ্যুত ফুলগুলা টুপ্ টুপ্ করিয়া তাহার আশে পাশে গায়ে মাথায় পড়িতেছিল; মাথার উপর একটা কোকিল ডানা গুটাইয়া চুপ্ করিয়া বসিয়াছিল; সম্মুখের পথ দিয়া কৃষকেরা মেটো সুরে গাহিতে গাহিতে যাইতেছিল,—

"আয় রে ভাই কানাই বলাই যাই গোচারণে।"

গৌরী এক এক ছড়া মালা শেষ করিয়া সূতার দুই মুখে গ্রন্থি দিয়া পাশে রাখিয়া দিতেছিল।

এক এক করিয়া তিন ছড়া মালা গাঁথা হইল, তথাপি গৌরী যাহার প্রতীক্ষা করিতেছিল, সে আসিল না। গৌরী মালাগুলা গণিয়া দেখিল, এক দুই তিন। তিন ছড়া মালা গাঁথা হইল, তবু সে আসিল না! দূর, আর তার মালা গাঁথবো না। রাগে গৌরী সংগৃহীত ফুলগুলাকে ছড়াইয়া ফেলিয়া চুপ করিয়া রহিল!

কিন্তু বেশীক্ষণ চুপ করিয়া থাকিতে পারিল না। একটু পরেই উঠিয়া বিক্ষিপ্ত ফুলগুলাকে পুনরায় একটি একটি করিয়া কুড়াইয়া জড় করিল। জড় করা ফুলের সঙ্গে একটা ফুটন্ত গোলাপ রহিয়াছে যে! এতক্ষণ গৌরী ত সেটা লক্ষ্য করে নাই! ক্ষিপ্রহস্তে তাড়াতাড়ি সেই ফুলটি তুলিয়া লইয়া শুঁকিতে শুঁকিতে বলিয়া উঠিল, "আঃ, গোলাপের কি মিঠে খোসবাই রে!" তার পর পুনরায় সূচ সূতা লইয়া আর এক ছড়া মালা গাঁথিতে বসিল।

"এখনো কেন এলো না? ঠিক এই সময়ে আসবার কথা। এসে সে ঠাকুর গ'ড়ে দেবে, গৌরী ফুলমালা দিয়ে সেই ঠাকুরের পূজো করবে। কিন্তু মালা তো গাঁথা হয়ে গেল, কোথায় বা সে, কোথায়

বা তার ঠাকুর। ভুলে গেছে কি? না, ভুলবার লোক সে নয়। হয় তো কি কাজ পড়েছে! কাজ তো অনেক,—গরু বাঁধা, বাজার করা, দোকানে যাওয়া। ছেলে বওয়াও একটা কাজ আছে। সকালে বাজারও নাই, দোকানও নাই, গরু বাঁধতেও এতক্ষণ যায় না। তা হ'লে ছেলে বইতে হচ্চে নিশ্চয়। নাঃ, কি গোলামি! ঠিক যেন মাইনে-খেকো চাকর। তা মাইনের মধ্যে তা শুধু ভাত-কাপড়। তাও মিষ্টি মুখে নয়। লোকটার কি সহ্য গুণ! আমি হ'লে তো এত হেনস্তা কক্ষনো সইতে পারতাম না। ব্যাটাছেলে—কেমন ক'রে যে সয়, তা সে-ই জানে।"

গাছের ডালে কোকিলটা এবার ডাকিয়া উঠিল, কু-উ। গৌরী একবার মাথা তুলিয়া কোকিলটার দিকে চাহিল; তার পর একটা ইটের টুক্‌রা কুড়াইয়া লইয়া উপর দিকে ছুঁড়িয়া দিল। সে ইটের টুক্‌রা কোকিলটার অঙ্গস্পর্শ না করিলেও সে ডাকিতে ডাকিতে উড়িয়া গেল; গৌরী আপন মনে খিল্‌ খিল্‌ করিয়া হাসিয়া উঠিল।

হাসিতে হাসিতে গৌরী পুনরায় এক মুঠা ফুল লইয়া একটি একটি করিয়া স্থচের আগায় পরাইতে আরম্ভ করিল। এমন সময় পশ্চাৎ হইতে কে ডাকিল, "গৌরী!"

গৌরী চমকিত হইয়া আগ্রহান্বিতভাবে পশ্চাতে ফিরিয়া চাহিল; চাহিয়াই বলিয়া উঠিল, "কে, উপীনদা না কি?"

উপেন ধীরে ধীরে আসিয়া তাহার পাশে দাঁড়াইল।

"এই বুঝি তোমার সকাল উপীনদা?"

"সকাল নয় তো দু'পুর না কি?"

"দুপুর হ'তে আর বেশী দেরী নাই।"

"ঢের দেরী এখনও। ততক্ষণে তোর বোধ হয় পঞ্চাশ ছড়া মালা গাঁথা হয়ে যাবে।"

"আমার পঞ্চাশ ছড়া মালায় দরকার নাই, দু'ছড়া হ'লেই যথেষ্ট।"

"দু'ছড়ার বেশী যেগুলো হয়েছে, সেগুলো কি হবে?"

"তোমার দরকার থাকে, নিতে পার।"

"ফুলের মালায় আমার দরকার নাই। মালা নিয়ে আমি কি ক'রবো?"

"তোমার ক'নের গলায় পরিয়ে দেবে।"

"আমার ক'নে আমার মালা পরতে চায় না।"

"কেন চায় না?"

"কেন চায় না, তা সে-ই জানে। বোধ হয়, আমি পয়সা রোজগার কত্তে পারি না ব'লে।"

উপেনের মুখের উপর সহাস্য কটাক্ষ নিক্ষেপ করিয়া গৌরী বলিল, "তা হ'লে তোমার বড়ই দুখ্যু উপীনদা।"

উপেন একটা ক্ষুদ্র নিশ্বাস ত্যাগ করিয়া বিষাদ-গম্ভীর স্বরে বলিল, "সেই দুঃখেই তো বিবাগী হয়ে চ'লে যাচ্চি।"

আশ্চার্য্যের ভাব দেখাইয়া গৌরী ব্যস্ততার সহিত বলিয়া উঠিল, "বল কি উপীনদা, একেবারে বিবাগী হয়ে যাচ্চো?"

"হাঁ, আজই আমি এ দেশ ছেড়ে চ'লে যাবো।"

"সত্যি?"

"সত্যি।"

"কোথায় যাবে?"

"যে দেশে পয়সা আছে।"

"সেখানে গিয়ে কি করবে?"

"পয়সা রোজগারের চেষ্টা করবো।"

"তোমার এত পয়সার দরকার হ'লো কেন ?"

"মানুষ মাত্রেরই পয়সার দরকার হয়।"

"কৈ, আমার তো পয়সার দরকার হয় না।"

"কখনও দু'একটা পয়সারও দরকার হয় না ?"

একটু ভাবিয়া গৌরী বলিল, "তা হয় বটে, দরকার হ'লে মামীমা সে পয়সা দেয়।"

উপেন বলিল, "তোকে তোর মামীমা দেয়, কিন্তু আমাকে কে দেবে ?"

"কেন, তোমার দিদি।"

"দিদির হাতে পয়সা নাই। থাক্‌লেও আমাকে দেবে কেন ?"

"কেন দেবে না ?"

"আমি ব্যাটাছেলে, আমার পয়সা রোজগার করবার কথা। মেয়েমানুষ আমাকে পয়সা কেন দেবে ?"

চিন্তিতভাবে গৌরী বলিল, "তোমার কত পয়সার দরকার উপীনদা ?"

ঈষৎ হাসিয়া উপেন বলিল, "তুই কত দিতে পারিস্ ?"

"তিনটে পয়সা দিতে পারি। আমার কাছে তিন পয়সা আছে।"

"তিন পয়সায় আমার কিছু হবে না। আমার তিনটা টাকার দরকার।"

"টাকা ? টাকা তো আমার কাছে নাই, উপীনদা !"

ম্লান হাস্যসহকারে উপেন বলিল, "টাকা যে তোর নাই, তা আমি জানি। কাজেই টাকার চেষ্টায় আমাকে যেতে হবে।"

নতমুখে গৌরী জিজ্ঞাসা করিল, "যেতেই হবে ?"

উপেন। হাঁ, যেতেই হবে।

গৌরী। টাকার তোমার কি এত দরকার, উপীনদা ?”

উপেন। ডাক্তারকে ওষুদের দাম দিতে হবে।

গৌরী। কে ওষুদ খেয়েছিল? তুমি ?

উপেন। না, মেনীর মা।

গৌরী। মেনীর মা ওষুদ খেয়েছিল, তুমি তার টাকা দিতে যাবে কেন ?

উপেন। মেনীর মা'র টাকা দেবার ক্ষমতা নাই! ওরা যে বড্ড গরীব, গৌরী।

গৌরী। টাকা দিতে পারবে না, তবে ওষুদ খেলে কেন ?

উপেন। ওষুদ না খেলে মারা যেতো।

গৌরী নীরবে কিছুক্ষণ ভাবিয়া বলিল, “আচ্ছা উপীনদা, এক কাজ করলে হয় না ?”

উপেন। কি কাজ ?

গৌরী। আমার কানের মাকড়ী একটা যদি খুলে দিই, সেটা বেচলে তিন টাকা হবে না ?

উপেন। তা হবে। কিন্তু তোর মাকড়ী—

গৌরী। হলোই বা আমার মাকড়ী। আমার জিনিস কি তোমার নিতে নাই ?

উপেন। নিতে আছে, কিন্তু তোর মামী যখন মাকড়ীর খোঁজ করবে ?

গৌরী। বলবো, হারিয়ে গিয়েছে।

তিরস্কারের স্বরে উপেন বলিল, “ছিঃ গৌরী, এরই মধ্যে এত মিথ্যা বল্‌তে শিখেছিস্!”

গৌরী লজ্জিতভাবে ঘাড় হেঁট করিয়া বসিয়া রহিল; . উপেন একটা বকুল ডাল ভাঙ্গিয়া তাহার পাতা ছিঁড়িতে ছিঁড়িতে বলিল, "আমি চ'লে গেলে তোর খুব আমোদ হবে, না গৌরী ?"

তাহার দিকে সকোপ কটাক্ষ নিক্ষেপ করিয়া ভারী গলায় গৌরী উত্তর করিল, "হাঁ, হবে।"

উপেন বলিল, "বেশ! তা হ'লে আয়, তোর ঠাকুরটা গ'ড়ে দিয়ে যাই। আমাকে আজই যেতে হবে।"

গৌরী উঠিয়া দাঁড়াইল; বলিল, "তুমি ঠাকুর গড়, আমি এক্ষুণি আসছি।"

গৌরী দ্রুতপদে বাড়ীর দিকে চলিয়া গেল। সে আগে হইতেই কাদা সংগ্রহ করিয়া রাখিয়াছিল। উপেন সেই কাদা লইয়া কৃষ্ণঠাকুর গড়িতে বসিল।

ঠাকুর গড়া প্রায় শেষ হইয়াছে, এমন সময় গৌরী তথায় উপস্থিত হইল এবং কাপড়ের ভিতর হইতে এক ছড়া গিনির মালা বাহির করিয়া উপেনের সম্মুখে ধরিল। উপেন তাহা দেখিয়াই চমকিতভাবে বলিয়া উঠিল, "এ কি গৌরী ?"

গৌরী বলিল, "এ আমার গিনির মালা। আমার মায়ের ছিল, মা আমাকে দিয়ে গিয়েছে।"

উপেন। এটাকে কেন নিয়ে এলি ?

গৌরী। তোমার যে টাকার দরকার!

উপেন! সর্ব্বনাশ, এটা বেচে টাকার যোগাড় করবো না কি ?

গৌরী নিরুত্তরে দাঁড়াইয়া রহিল। উপেন বলিল, "এটার দাম কত জানিস্ ?"

"কত ?"

"চার পাঁচ শোর কম নয়। এর এক একখানা গিনির দামই বিশ পঁচিশ টাকা।"

সঙ্কুচিতভাবে গৌরী বলিল, "তা হ'লে একখানা গিনি খুলে নিয়ে—"

তাহাকে ধমক দিয়া উপেন বলিল, "আমি তো তোর মত পাগল নই। যদি ভাল চাস্ তো ঘরে রেখে আয়।"

ভীতিবিনম্র স্বরে গৌরী জিজ্ঞাসা করিল, "নেবে না তুমি ?"

দৃঢ়স্বরে উপেন বলিল, "নাঃ। এই নে তোর ঠাকুর। তোর ঠাকুর গ'ড়ে দেবার জন্যই এসেছি। নয় তো এতক্ষণ—"

"এতক্ষণ কদ্দূর চ'লে যেতে, না ?"

"নিশ্চয়।"

"তবে এলে কেন ?"

"তোকে ঠাকুর গ'ড়ে দেব বলেছিলাম।"

গৌরী নীরবে তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে উপেনের দিকে চাহিয়া রহিল। উপেন ঠাকুর গড়া শেষ করিয়া উঠিয়া দাঁড়াইল, এবং গৌরীকে লক্ষ্য করিয়া সহাস্যমুখে বলিল, "এই নে তোর ঠাকুর। দেখ দেখি, কেমন ঠাকুর হয়েছে ?,'

গৌরী সদর্পে ঘাড় দোলাইয়া রোষগম্ভীর মুখে 'বলিল, "আমি ঠাকুর চাই না।" বলিয়াই সে ঠাকুরকে তুলিয়া লইয়া দূরে আছড়াইয়া ফেলিল, তার পর অবজ্ঞাভরে হাতখানা ঘুরাইয়া বলিল, "আহা, কি ঠাকুরই গড়েছ, আমি অমন ঠাকুর চাই না।"

উপেন বলিল, "আরে ম'লো, এত কষ্টে ঠাকুর গড়লাম, আর তুই ভেঙ্গে ফেললি ?"

গৌরী তাহার কথায় কর্ণপাত করিল না; সে রাগে ফুলিতে ফুলিতে ফুলের মালাগুলা খণ্ড খণ্ড করিয়া ছিঁড়িয়া ফেলিল। তারপর

সেই ছেঁড়া মালাগুলা উপেনের গায়ে ছুঁড়িয়া দিয়া কাঁদিতে কাঁদিতে ছুটিয়া পলাইল। উপেন কিছুক্ষণ হতবুদ্ধির মত সেই স্থানে দাঁড়াইয়া রহিল, তার পর ক্ষুণ্ণমনে ধীরে ধীরে সে স্থান ত্যাগ করিল। যাইতে যাইতে টাকা তিনটা কিরূপে সংগ্রহ করিবে, তাহাই ভাবিতে লাগিল। দিদির কাছে চাহিতে সাহস হয় না; চাহিলেও দিবে বলিয়া বোধ হয় না। ঘোষজা মশায়ের কাছে কোন্ লজ্জায় টাকা চাহিবে? ভাবিতে ভাবিতে হঠাৎ বড়দির কথা মনে পড়িল। বড়দির কাছে চাহিলে তিনি কি দিবেন না? দিক্, না দিক্, চাহিয়া দেখিতে দোষ কি? দোষ কিছুই নাই, বড়দির কাছে লজ্জাও নাই। উপেন দ্রুতপদে বড়দির বাটীর অভিমুখে চলিল।



দয়ারামের জ্ঞাতি নীলু ঘোষের স্ত্রী কাদম্বিনীকে উপেন বড়দি বলিয়া ডাকিত। জ্ঞাতি হইলেও দয়ারামের সহিত নীলু ঘোষের তেমন সম্প্রীতি ছিল না, সামান্য খুঁটিনাটি লইয়া মধ্যে মধ্যে ঝগড়া-বিবাদ বাধিত, এবং সে বিবাদ তেমন প্রবল আকার ধারণ না করিলেও পরস্পরের মধ্যে বেশ মনের মিল ছিল না। নীলু ঘোষ দুধে-ভাতে থাকে, দয়ারামের ইহা সহ্য হইত না, নীলু ঘোষও দয়ারামের উন্নতি ঈর্ষার চক্ষে নিরীক্ষণ করিত। কেবল পুরুষমহলে নয়, মেয়েদের মধ্যেও এই ভাবটা সংক্রামিত হইয়াছিল। কাদম্বিনী বা কুসুম পরস্পরের ছিদ্রান্বেষণে রত থাকিত, এবং সুযোগ পাইলেই নিন্দায় শতমুখ হইয়া পড়িত।

উপেনের কিন্তু এ সকল বালাই ছিল না, জ্ঞাতিসুলভ ঈর্ষা তাহার মধ্যে সংক্রামিত হইতে পারে নাই। কাজেই দিদি বা ঘোষজা-

মশায়ের সহিত মনোমালিন্য সত্ত্বেও সে কাদম্বিনীর সহিত বেশ মনের মিল করিয়া লইয়াছিল। কাদম্বিনী সম্পর্কে কুসুমের বড় জা, সুতরাং কুসুম তাহাকে বড়দিদি বলিয়া ডাকিত। সেই সম্পর্কে উপেনও কাদম্বিনীকে বড়দি বলিয়া ডাকিত; শুধু বড়দি বলিয়া ডাকিত না, বড়দির ন্যায় শ্রদ্ধাভক্তিও প্রদর্শন করিত। কাদম্বিনীও তাহাকে ঠিক ছোট ভায়ের মত স্নেহযত্ন করিতে পরাঙ্মুখ হইত না। দিদির কাছে তিরস্কৃত হইয়া উপেন দুঃখে অভিমানে অধীর হইয়া যখন কাদম্বিনীর কাছে যাইত, কাদম্বিনী তখন স্নেহপূর্ণ সান্ত্বনায় তাহার অভিমানক্ষুব্ধ হৃদয়কে মুহূর্ত্তে শান্ত করিয়া দিত। কতদিন উপেন দিদির উপর রাগ করিয়া অনাহারে থাকিবার সঙ্কল্প করিয়াছে, কিন্তু কাদম্বিনী তাহা জানিতে পারিলেই তাহার সে সঙ্কল্পকে ব্যর্থ করিয়া দিয়াছে। সে ভাত বাড়িয়া 'লক্ষ্মী ভাই আমার' বলিয়া উপেনের হাত ধরিয়া যখন ভাতের কাছে বসাইয়া দিত, তখন উপেন তাহার সেই সস্নেহ অনুরোধ রক্ষা না করিয়া থাকিতে পারিত না। এইরূপ স্নেহে যত্নে উপেন কাদম্বিনীর এতই বশীভূত হইয়া পড়িয়াছিল যে, তাহাকে জ্যেষ্ঠা সহোদরা ভিন্ন অন্য কিছুই ভাবিতে পারিত না, এবং কুসুমের নিষেধ সত্ত্বেও সে এক একবার কাদম্বিনীর কাছে না গিয়া থাকিতে পারিত না। এই বড়দিকে যদি না পাইত, তাহা হইলে উপেন বোধ হয়, এত দিন দিদির ঘরে থাকিতে সমর্থ হইত না।

কাদম্বিনীর সহিত উপেনের এই সম্প্রীতিটুকু কুসুম কিন্তু আদৌ পছন্দ করিত না। "জ্ঞাতি শত্রু—একটু ছুতা পাইলেই যে পাঁচ কথা শুনাইয়া দেয়, সামান্য ত্রুটি দেখিলেই নিন্দায় শতমুখ হইয়া পড়ে, তাহার সহিত এত ঘনিষ্ঠতা কেন? দয়ারামও কত দিন

এইরূপ অবৈধ ঘনিষ্ঠাতার প্রতিকূলে মত প্রকাশ করিয়াছে। কেন, ঘরে কি বসিবার জায়গা নাই, না গল্প করিবার লোক গ্রামে নাই ? উপেন কি বাড়ীতে খাইতে পায় না? কিন্তু হতভাগার কেমন স্বভাব, বড়দির কাছে না গেলে যেন উহার প্রাণ বাঁচে না, বড়দির ঘরের ফেন-ভাত একমুঠা না খাইলে হতভাগার পেট যেন ভরে না। প্রত্যহ না হউক, মাসের মধ্যে অন্ততঃ পাঁচটা দিনও ঐখানে গিয়া উহাকে ফেন-চাটিতে হইবে। কুসুম ভাইকে নিষেধ করিত, গালাগালি দিত, নির্ব্বোধ উপেন কিন্তু তাহার নিষেধ বা তিরস্কারকে কিছুমাত্র গ্রাহ্য করিত না। কুসুম ইহাতে এক এক সময় রাগিয়া উপেনকে যাহা মুখে আসিত, তাহাই বলিয়া তিরস্কার করিত, উপেন সে সকল তিরস্কার হাসিয়াই উড়াইয়া দিত।

তা কুসুমকে এজন্য দোষ দেওয়া যায় না, কেন না, অল্প দুঃখে সে উপেনকে নিষেধ বা তিরস্কার করিত না। উপেনের একটা স্বভাব ছিল, সে কোন কথাই গোপনে রাখিতে পারিত না; বিশেষতঃ নিজের সুখ-দুঃখের কথাগুলা বড়দিকে না বলিয়া কিছুতেই থাকিতে পারিত না। দিদি কবে তাহাক কি রূঢ় কথা বলিয়াছে, পরের ভাতে থাকার জন্য কবে কি তিরস্কার করিয়াছে, সাংসারিক কার্য্যে সামান্য ত্রুটি হইলেই ঘোষজা মশাই পর্য্যন্ত তাহাকে কত কথা শুনাইয়া দিয়াছে, বড়দির কাছে সেই সকল কথা ব্যক্ত করিয়া নিজের নিরাশ্রয় অবস্থার জন্য দুঃখ প্রকাশ করিত। কাদম্বিনী তাহার দুঃখে যথেষ্ট সহানুভূতি প্রকাশ করিত বটে, কিন্তু কথাচ্ছলে কুসুমের আছে সেই সকল প্রসঙ্গ উত্থাপন করিয়া উপেনের উপর এইরূপ রূঢ় ব্যবহারের জন্য কুসুমকে তিরস্কার না করিয়া ছাড়িত না। কখন বা এই সকল কথা লইয়া পাড়ার পাঁচ জনের কাছেও গল্প করিত। তাহারা আবার

সময়ে সময়ে উপদেশচ্ছলে কুসুমকে বেশ পাঁচকথা শুনাইয়া দিত। তাহা শুনিয়া রাগে কুসুমের আপাদমস্তক জ্বলিয়া যাইত। হতভাগা ভাইটাকে লইয়া সে যে কি করিবে, তাহা ভাবিয়া পাইত না। এক এক সময়ে সে উপেনকে বাড়ী হইতে দূর করিয়া দিবার জন্য দৃঢ়সংকল্পবদ্ধ হইত, কিন্তু তাহাতে অধিকতর লোকনিন্দাভাজন হইতে হইবে, বা নিরাশ্রয় উপেন কোথায় গিয়া আশ্রয় লইবে ইত্যাদি বুঝাইয়া দিয়া দয়ারাম স্ত্রীকে শান্ত করিত। অবস্থা বুঝিয়া কুসুম শান্ত হইত বটে, কিন্তু কাদম্বিনী উপেনের সম্বন্ধে কোন কথা বলিতে আসিলেই তাহার মর্ম্মস্থল পর্য্যন্ত যেন জ্বলিতে থাকিত! উপেন কুসুমের ভাই—কিন্তু কাদম্বিনীর কে? কুসুম অপেক্ষা উপেনের উপর টান কি তাহার বেশী? তবে সে পর হইয়া এত দরদ দেখাইতে আসে কেন? ইহাতে কুসুমকে ভ্রাতৃস্নেহশূন্য নিষ্ঠুর প্রতিপন্ন করাই কি কাদম্বিনীর উদ্দেশ্য নয়? কুসুমকে লজ্জা দিবার জন্যই সে এইরূপ অস্বাভাবিক দরদ দেখাইতে আইসে। রাগে কুসুম উপেনের উপর দৃঢ় আজ্ঞা প্রচার করিত, যেন কাদম্বিনীর বাড়ীর ত্রিসীমানায় না যায়।

তাহার এই নিষেধের ফলে উপেন দুই চারি দিন যাতায়াত বন্ধ রাখিত। কিন্তু তার পর আবার যেমন যাওয়া-আসা ছিল, তেমনই করিত। দুই চারি দিনের বেশী কুসুমের আদেশ সে প্রতিপালন করিতে পারিত না; বড়দির কাছে না গেলে তাহার যেন আহার-নিদ্রা কিছুতেই তৃপ্তি হইত না, দিনগুলা পর্য্যন্ত যেন নিতান্তই অচল হইয়া পড়িত।

শুধু উপেন একা নয়, দুই চারিদিন তাহার দেখা না পাইলে কাদম্বিনীও একটু ব্যস্ত হইয়া পড়িত, এবং উপেন কেন যায় নাই,

জানিবার জন্য কুসুমের কাছে ছুটিয়া যাইত। তাহার এই ব্যস্ততা দেখিয়া কুসুম মুখ মচ্‌কাইয়া হাসিত, এবং নিতান্ত উপেক্ষা সহকারেই উপেনের অনুপস্থিতি জন্য যে কৈফিয়ৎ দিত, তাহা কাদম্বিনীর তেমন সন্তোষজনক হইত না। না হইলেও এবং কুসুমের তাচ্ছীল্য বা উপহাসটুকু বুঝিতে পারিলেও কাদম্বিনী উপেনের তত্ত্ব না লইয়া থাকিতে পারিত না।



"বড়দি!"

"কে রে, উপেন না কি? ক'দিন কোথায় ছিলি রে উপেন?"

"কোথায় আবার থাকবো বড়দি, বরাবর যেখানে আছি, সেইখানেই ছিলাম।"

"তবে ক'দিন তোকে দেখতে পাই না কেন? তোর দিদি বুঝি আসতে মানা করেছিল?"

ঈষৎ হাসিয়া উপেন বলিল, "দিদি মানা করে নাই, আমিই একটু কাজে ব্যস্ত হয়ে পড়েছিলাম।"

সহাস্যে কাদম্বিনী জিজ্ঞাসা করিলেন, "তুই তো তা হ'লে মস্ত কাজের লোক হয়ে উঠলি দেখছি। কি এমন কাজ রে উপেন?"

উপেন উত্তর করিল, "একটা রুগী নিয়ে পড়েছিলাম।"

কাদ। রুগী কে রে? ধনা হাড়ি নাকি?

উপে। না বড়দি, এবারে হাড়ি-বাগ্দী নয়, ভদ্রলোক রুগী।

কাদ। তবু ভাল। আমি তো জানতাম, হাড়ি-ডোম-বাগ্দীদের রোগ হ'লেই তোর মাথাব্যথা হয়।

উপে। তাদের তরে তোমারও তো মাথাব্যথা হয় বড়দি। তারা খেতে না পেলে তুমি চাল, ধান, পয়সা বা'র ক'রে দাও।

কুঞ্চিতমুখে কাদম্বিনী বলিল, "হাঁ, চাল-ধান তো আমি রোজই দিচ্চি। দৈবাৎ কালে ভদ্রে—"

হাসিতে হাসিতে উপেন বলিল, "আর আমিই বা কোন্ তিরিশ দিন তাদের সেবা ক'রে বেড়াচ্চি! বরং তারা খেতে পায় না মাসে দশ দিন, কিন্তু তাদের রোগ হয় বছরে বড় জোর দু'দিন।"

কথাটাকে চাপা দিবার অভিপ্রায়ে কাদম্বিনী যেন একটু বিরক্তির সহিত বলিল, "আচ্ছা, আচ্ছা, তোরি জিৎ, আমারি হার। এখন তোর ভদ্রলোক রুগীটি কে শুনি।"

মাথা চুলকাইয়া উপেন বলিল, "ও পাড়ার মেনীকে জান?"

কাদ। কে, হিরু সরকারের মেয়ে মেনী?

উপে। হাঁ হাঁ, সেই যে খুব কালো-কুচ্ছিত মেয়েটা গো।

কাদ। ঠাকুরপো যার সঙ্গে তোর বিয়ের কথা কইছে তো?

ভ্রূভঙ্গী করিয়া মস্তক আন্দোলন সহকারে উপেন বলিল, "এত খবর আমি রাখি না।"

সহাস্যে কাদম্বিনী বলিল, "তোর বিয়ের খবর তুই রাখবি না তো কে রাখবে রে?"

বিরক্তভাবে উপেন বলিল, "যার বেশী মাথাব্যথা, সে-ই রাখ্‌বে।"

হাসিয়া কাদম্বিনী বলিল, "আচ্ছা, তারাই না হয় রাখ্‌বে। এখন মেনীর কি অসুখ হয়েছিল শুনি।"

উপে। মেনীর অসুখ কে বল্‌লে! তার মায়ের অসুখ।

কাদ। তার মায়ের অসুখ! অসুখটা কি?

উপে। জ্বর, কাস, মাথার যন্ত্রণা।

কাদ। তোকে খবর দিলে কে?

উপে। খবর আবার কে দিতে যাবে? একদিন ওদের বাড়ীর সামনে দিয়ে আসছি, মেয়েটা কাঁদতে কাঁদতে হন্তদন্ত হ'য়ে বাড়ী থেকে বেরিয়ে আমার হাতখানা ধ'রে ফেল্লে।

কাদ। মেয়েটা তা হ'লে তোকে চেনে বল্।

উপে। চেনে না আবার? বেশ চেনে। সে দিন আমার হাতে বেশ দু'চার ঘা খেয়েছে।

কাদ। মার খেলে কেন?

উপে। মার খেয়েছে ওর নিজের দোষে নয়, গৌরীর দোষে। সে পোড়ারমুখী যদি ওর আঁচল টেনে নিয়ে আমার কোঁচার খুঁটের সঙ্গে গাঁটছড়া বেঁধে না দিত—"

খিল্ খিল্ করিয়া হাসিতে হাসিতে কাদম্বিনী বলিল, "এর মধ্যে তা হ'লে তোদের গাঁটছড়া বাঁধা হয়ে গিয়েছে? ও হরি, আমি বলি, এই শুধু বিয়ের কথাবার্ত্তা হচ্চে।"

রাগে মুখ ভারী করিয়া উপেন বলিল, "যাও! আমি চললুম তবে।"

ব্যস্ততার সহিত কাদম্বিনী বলিল, "না না, তোকে চ'লে যেতে হবে না। আমি তামাসা ক'রে বলছি। যাক্, মেনীর মা বেশ সেরে উঠেছে?"

উপে। হাঁ, আজ পথ্য পাবে।

কাদ। তোকে বুঝি ক'দিন ওখানে থেকে সেবা-শুশ্রূষা কত্তে হয়েছিল?

উপে। সেবা এমন কিছু কত্তে হয় নি। শুধু ডাক্তার ডাকা, ওষুদ এনে দেওয়া।

কাদ। কোন্ ডাক্তার দেখলে?

উপে। অতুল ডাক্তার।

কাদ। কত নিলে ?

উপে। গরীব ব'লে ভিজিট এক পয়সাও নেয়ে নি। শুধু ওষুদের দাম তিন টাকা দিতে হবে।

কাদ। দিতে হবে ? দেওয়া হয় নি এখনও ?

উপে। না, এখনও টাকাটার যোগাড় ক'রে উঠতে পারি নাই।

কাদ। কে যোগাড় করবে, তুই ?

উপে। হাঁ, আমিই দেব ব'লে স্বীকার হয়েছি।

কাদ। কেন, ওরা দেবে না ?

উপে। দেবার শক্তি ওদের নাই।

কাদ। বলিস্ কি রে, এত গরীব হয়ে পড়েছে ?

উপে। একটা ঘটী বাঁধা দিয়ে সাবু-মিছরী এনে দিয়েছি।

মেনীর মা'র দুরবস্থা শ্রবণে কাদম্বিনীর হাস্যপ্রফুল্ল মুখমণ্ডল গভীর বেদনায় মলিন হইয়া আসিল। সে কিয়ৎক্ষণ নীরবে থাকিয়া ব্যথিত স্বরে জিজ্ঞাসা করিল, "এত গরীব! মাগী তা হ'লে মেয়ের বিয়ে দেবে কেমন ক'রে ?"

উপেন বলিল, "বোধ হয়, ঘর-ভিটে বেচে। জমী নাকি দু'চার বিঘে আছে। চুলোয় যাক্, তার মেয়ের ভাবনা সে ভাববে, আমি এখন ডাক্তারের টাকা মিটিয়ে দিতে পারলে হয়।"

কাদ। তুই টাকা কোথায় পাবি ?

উপে। তাই ভাবচি। কেউ কি ধার দেবে না ?

কাদ। ধার দিতে পারে, কিন্তু ধার তুই শোধ করবি কিসে ?

মাথা নাড়িয়া উপেন বলিল, "সে যুক্তি আমি ঠিক ক'রে ফেলেছি বড়দি, চাকরী ক'রে ধার শোধ করবো।"

কাদম্বিনী জিজ্ঞাসা করিল, "চাকরী করবি তা হ'লে ?"

দৃঢ়স্বরে উপেন বলিল, "নিশ্চয়। এ রকমে ব'সে ব'সে আর থাচ্ছি না।"

কাদ। কি চাকরী করবি ?

উপে। যা পাই। অবশেষে মুটেগিরি।

কাদ। সত্যি ?

উপে। তোমার পায়ে হাত দিয়ে বলতে পারি বড়দি, চাকরী এবার করবোই করবো। আমার এবার ভয়ানক ঘেন্না হয়েছে।

কাদ। কিসে এত ঘেন্না হ'লো শুনি।

উপে। দিদি কা'ল বড্ড কথা শুনিয়ে দিয়েছে।

কাদ। সে তো এমন চিরকালই কথা শোনায়।

দুঃখগম্ভীর মুখে উপেন বলিল, "শোনায় বটে, কিন্তু এমনতর কড়া কথা,—না বড়দি, ব্যাটাছেলে, হাত-পা আছে, কেন বল তো এত কথা শুনবো ?"

ঈষৎ হাসিয়া কাদম্বনী বলিল, "সে তো ঠিক কথা। আমিও তো তোকে কতদিন বলেছি, একটা কাজকর্ম্ম কর্ উপেন।"

জোরে মাথা নাড়িয়া উপেন বলিল, "বলেছ তো, কিন্তু কি কাজ করবো ?"

কাদম্বিনী বলিল, "এখনই বা কি কাজ করবি ?"

উপেন বলিল, "এখন যা পাই। মোট বইতে হয়, তাও স্বীকার।"

কাদম্বিনী বলিল, "মোট বইতে পারবি ?"

দৃঢ়স্বরে উপেন বলিল, "খুব পারবো। কেন, আমার গায়ে কি জোর নাই ?"

সহাস্যে কাদম্বিনী বলিল, "তা আছে। তা হ'লে যাচ্ছিস্ কবে ?"

উপেন বলিল, "কবে কি? ডাক্তারের টাকা আর রেলভাড়াটার যোগাড় হ'লেই চ'লে যাই। তুমি গোটা চার টাকা ধার দেবে বড়দি?"

কাদম্বিনী বলিল, "ধার দিতে পারি, কিন্তু চার টাকা তো দিতে পারবো না, তিন টাকা হাতে আছে।"

"বেশ, তাই দাও।"

"কিন্তু দিবি তো?"

"দেব না? মাইনে পেলে আগে তোমার টাকা পাঠিয়ে দিয়ে তবে অন্য কথা।"

"আমাকে মনে থাকবে তো?"

বিস্ময়-বিস্ফারিত দৃষ্টিতে কাদম্বিনীর মুখের দিকে চাহিয়া উপেন বলিল, "বল কি বড়দি, তোমাকে মনে থাক্‌বে না?"

ঈষৎ হাসিয়া কাদম্বিনী বলিল, "কি জানি।"

"কি জানি!" উপেন বসিয়াছিল, যেন লাফাইয়া উঠিয়া দাঁড়াইল, জোর গলায় বলিল, "কি জানি! তোমার কথা আমি ভুলতে পারবো? তুমি আচ্ছা লোক তো বড়দি!"

উপেনের স্বরটা যেন ভারী হইয়া আসিল। কাদম্বিনী স্নেহ-সজল দৃষ্টিতে তাহার আবেগস্ফীত মুখের দিকে চাহিয়া আঁচলে চোখ মুছিল।

—১০—

"হাঁ মা!"

"কেন মেনী?"

"আজ না ডাক্তার তোমায় ভাত খেতে ব'লেছে?"

কুঞ্চিতমুখে নিস্তারিণী উত্তর করিলেন, "বলেছে খেতে।"

মেনী জিজ্ঞাসা করিল, "কিন্তু কি দিয়ে ভাত খাবে?"

যেন নিতান্ত উপেক্ষায় মুখ মচ্‌কাইয়া নিস্তারিণী বলিলেন, "যা দিয়ে হয়,—চুলোর ছাই দিয়ে!"

মায়ের এই উত্তরে দুঃখ অনুভব করিয়া মেনী বলিল, "তোমার মা ঐ এক কেমন কথা। ছাই দিয়েও মানুষে ভাত খায়?"

নিস্তারিণী বলিল, "আমার মত মানুষে সব খায়।"

ঝঙ্কার দিয়া মেনী বলিল, "হাঁ, তোমাকে বলেছে খায়! এই তরেই কোন কথা তোমাকে বল্‌তে চাই না।"

ঈষৎ রুষ্টস্বরে নিস্তারিণী বলিলেন, "তবে আমাকে বল্‌তে আসিস্ কেন?"

ভারী মুখে মেনী বলিল, "ঝকমারি করেছি বল্‌তে এসেছি। তোমাকে বলবো না তো বল্‌তে যাব কা'কে? ওপাড়ার দুলে-বৌকে?"

গম্ভীরমুখে নিস্তারিণী বলিলেন, "তাই দুলে-বৌকেই বলতে যাবি এবার থেকে। খবরদার বল্‌ছি, আমাকে কোন কথা জিগ্যেস্ করিস্ না।"

মেনী বলিল, "আচ্ছা আচ্ছা, কোন কথাই জিগ্যেস্ করবো না, এখন কি রাঁধবো, তাই বল দেখি।"

নিস্তারিণী গম্ভীরভাবে নীরবে বসিয়া রহিল। মেনী জিজ্ঞাসা করিল, "আলু-বেগুণের ঝোল একটু ক'রে দেব?"

নিস্তা। আলু বেগুণ পাইবি কোথায়?

মেনী। আলু গোটা চার ঘরে আছে।

নিস্তা। আর বেগুণ?

মেনী। বেগুণ দুটো না হয় কারো ঘর থেকে চেয়ে আন্‌ছি।

নিস্তা। কার ঘরে চাইতে যাবি। কে তোর তরে বেগুণ কিনে রেখে দিয়েছে?

মেনী। গৌরীদের বাড়ীতে দেখি। ওদের রোজ বাজার আসে।

ক্রোধগম্ভীরমুখে নিস্তারিণী বলিল, "রোজ বাজার আসে, তাতে তোর কি বল্ তো? তোকে দেবার তরে কি রোজ বাজার ক'রে নিয়ে আসে?"

মেনী বলিল, "আমাকে দেবার তরে আন্‌বে কেন? আমি কি আর রোজই চাইতে যাচ্চি?"

নিস্তা। রোজ না হলেও মাঝে মাঝে তো চাইতে যাস্।

মেনী। কি করবো বল, ঘরে না থাকলেই চাইতে যেতে হয়।

নিস্তা। তোর মত বেহায়া মেয়ে যারা, তারাই চাইতে যায়। আমি তো সাত দিন সাত রাত উপোস দিতে হলেও কারও দোরে চাইতে যাই না।

ঘাড় দোলাইয়া মেনী বলিল, "ওগো, তুমি খুব বড়মানুষের মেয়ে, তাই উপোস দিতে হ'লেও কারও দোরে যাও না। উপোস দিতে তুমি যে খুব মজবুত, তা আমি বেশ জানি। কিন্তু আমি কাছে থাক্‌তে সেটি হচ্চে না মা! তাতে তুমি আমাকে ভালই বল আর মন্দই বল।

মেয়ের এই তিরস্কারের মধ্যে মাতৃস্নেহের মধুরতা অনুভব করিয়া মনে মনে পুলকিত হইলেও নিস্তারিণী মুখে তাহা প্রকাশ না করিয়া বরং একটু রাগের ভাব দেখাইয়া বলিল, "তুই আর কদ্দিন কাছে থাক্‌বি শুনি?"

"যদ্দিন হয়।"

"যদ্দিন কি, বড় জোর আর ছ'টা মাস। আস্‌ছে মাঘ ফাগুনে তোর গতি যা হয় কত্তেই হবে।"

"আচ্ছা, আমার গতি এর পর যা হয় ক'রো, এখন আমি আজ তোমার গতি তো করি।"

বলিয়াই মেনী বাড়ীর বাহিরে চলিয়া গেল। নিস্তারিণী ডাকিলেন, "ফিরে আয় মেনী, শোন্।"

মেনী কিন্তু ফিরিল না, উত্তরও দিল না। "বড় অবাধ্য মেয়ে" বলিয়া নিস্তারিণী ধীরে ধীরে রন্ধনশালায় প্রবিষ্ট হইয়া উনান ধরাইতে প্রবৃত্ত হইলেন।

নিস্তারিণী উনান ধরাইয়া উনানে ভাতের হাঁড়ী চাপাইয়াছেন, এমন সময় মেনী দুইটা বেগুন আঁচলে বাঁধিয়া ফিরিয়া আসিল, এবং মাকে রান্না চাপাইতে দেখিয়া রাগিয়া বলিল, "তুমি যে বড় রাঁধতে এসেছ?"

নিস্তারিণী বলিলেন, "রাঁধতে আসি নাই, তোর উনান ধরাতে কষ্ট হয়, তাই উনানটা ধরিয়ে দিতে এসেছি।"

মেনী রাগে মুখ ভার করিয়া বলিল, "হাঁ, আমার কষ্ট হয়! এই যে কদিন তুমি বিছানায় প'ড়ে ছিলে। তখন কে উনান ধরাতো?"

ঈষৎ হাসিয়া নিস্তারিণী বলিলেন, "যখন উঠবার ক্ষমতা ছিল না, তখন কষ্টই হোক, যাই হোক, তোকেই সব কাজ কত্তে হ'য়েছে। এখন আমি উঠতে পেরেছি—"

তর্জ্জন সহকারে মেনী বলিল, "বেশ, উঠতে পেরেছ, তবে নিজে রেঁধে খাও। আমি তো কিচ্ছু করবো না।"

বলিয়া সে আঁচলের বেগুণ দুইটা খুলিয়া মায়ের সম্মুখে ফেলিয়া দিল, এবং রান্নাঘরের দাবায় আসিয়া পা ছড়াইয়া বসিল। তাহার রাগ দেখিয়া নিস্তারিণী হাসিতে হাসিতে বলিলেন, "ধন্যি মেয়ে যা হোক্, কথায় কথায় রাগ। আচ্ছা মেনী, এর পর শ্বশুরবাড়ী গিয়ে তুই করবি কি? এমনি তুচ্ছ কথায় রেগে তালপাতার আগুন হয়ে যাবি?"

ক্রোধগম্ভীর কণ্ঠে মেনী উত্তর দিল, "হাঁ, হয়ে যাব।"

নিস্তারিণী বলিলেন, "তা হ'লে তোকে কত কথা শুন্‌তে হবে, তা জানিস্? আমি মা, সব স'য়ে যাচ্চি, কিন্তু শাশুড়ী ননদ—তারা তো এ সব সহ্য করবে না।"

রাগে গোঁ গোঁ করিতে করিতে মেনী বলিল, "না করে, না ক'রবে; তোমাকে তো সে সব সইতে হবে না।"

নিস্তারিণী কন্যাকে সান্ত্বনা দিয়া বলিলেন, "আমাকে সইতে হবে না বটে, কিন্তু তোকে যে অনেক দুর্গতি ভোগ কত্তে হবে। তা ছাড়া যদি বিধাতার ভবিতব্য থাকে, উপেনের সঙ্গেই তোর বিয়ে হয়, তা হ'লে ঐ ননদ নিয়ে কি ক'রে ঘর করবি, বল্ দেখি?"

মায়ের মুখের উপর সরোষ কটাক্ষ নিক্ষেপ করিয়া মেনী উঠিয়া দাঁড়াইল, এবং মাকে ঠেলিয়া দিয়া বলিল, "সে যুক্তি এর পর তোমার কাছে নেবো এখন তুমি ভাল মান্‌ষের মেয়ের মত ঐ দিকে গিয়ে চুপটি ক'রে বসো দেখি।"

নিস্তারিণী হাসিতে হাসিতে বলিলেন, "তা ওখানে না হয়, এই-খানেই চুপটি ক'রে ব'সে তরকারীটা কুটে দিই, তুই রাঁধ্।"

"না, তোমাকে এখানে আগুনতাতে থাকতে হবে না।" বলিয়া মেনী মায়ের হাত ধরিয়া টানিতে টানিতে তাঁহাকে রন্ধনশালার বাহিরে লইয়া আসিল।

এমন সময় উপেনকে ব্যস্তভাবে বাটীর মধ্যে প্রবিষ্ট হইতে দেখিয়া মেনী যেন সঙ্কুচিত হইয়া পড়িল; সে তাড়াতাড়ি মায়ের হাত ছাড়িয়া দিয়া ক্ষিপ্রপদে রান্নাঘরের দিকে চলিয়া গেল। উপেন কিন্তু তাহার এই সঙ্কোচটুকু লক্ষ্য করিল না, সে নিস্তারিণীর সম্মুখে উপস্থিত হইয়া ট্যাঁক হইতে দুইটা টাকা বাহির করিয়া ব্যস্ততার সহিত বলিল,

"ডাক্তারের তিন টাকা পাওনা। আমি অনেক কষ্টে এই দুটো টাকার যোগাড় করেছি। ডাক্তারকে এই দু'টাকা দিয়ে বলবেন, আমি ফিরে এসে তাঁর বাকী এক টাকা মিটিয়ে দেব।"

আশ্চর্য্যান্বিতভাবে তাহার মুখের দিকে চাহিয়া নিস্তারিণী জিজ্ঞাসা করিলেন, "তুমি কোথায় যাবে বাবা?"

উপেন বলিল, "কোথায় যাব, তা এখন ঠিক বলতে পারি না, তবে যেখানেই হোক গিয়ে একটা চাকরী-বাকরীর যোগাড় কত্তে হবে।"

"কেন?"

"কেন কি? ব্যাটাছেলে, চিরকাল ব'সে বোনের ভাত খাব, লোকে বলবে কি?"

উপেনের কথায় নিস্তারিণীর মুখে যেন একটু নিরাশার ছায়া পড়িল। উপেন যদি চলিয়া যায়, তাহা হইলে মেনীর বিবাহের কি হইবে? অথচ উপেন যাহা বলিতেছে, তাহাও নিতান্ত অসঙ্গত নয়, ব্যাটাছেলে এমন পরাধীন হইয়াই বা থাকিবে কেন? কিন্তু তাঁহার মেনীর উপায়? একটু ইতস্ততঃ করিয়া নিস্তারিণী বলিলেন, "তা বটে বাবা, ব্যাটা-ছেলে—পয়সা রোজগার করা দরকার। তবে—"

তাঁহার বক্তব্যে বাধা দিয়া উপেন জোর গলায় বলিল, "তবেই বুঝে দেখুন দেখি, এমন ক'রে ব'সে থাকলে তো পয়সা রোজগার হবে না! এক পয়সার ভিখিরী। এই দেখুন না, ডাক্তারকে তিনটে টাকা দিতে হবে, তা কত কষ্টে দুটি টাকার যোগাড় করেছি, তাও ভাগ্যে বড়দি ধার দিলে। তাও তিন টাকা দিলে না, ব'ল্লে, আর নাই।"

লজ্জামলিন মুখে নিস্তারিণী বলিলেন, "তা তুমি কেন এত কষ্ট ক'রে টাকার যোগাড় কত্তে গেলে বাবা? আমিই না হয় কোন রকমে যোগড় ক'রে দিতুম।"

উপেন হাসিয়া উঠিল; বলিল, "আপনি আর কোথা থেকে যোগাড় কত্তেন? ঘরের ঘটী-বাটি বেচতে হ'তো তো? তার চেয়ে আমিই না হয় ধার ক'রে দিলুম। ব্যাটাছেলে, দুটো টাকা ধার আর শুধ্‌তে পারবো না?"

নিস্তারিণী বলিলেন, "তা আর পারবে না বাবা, খুব পারবে। তবে—"

মাথাটা জোরে একবার নাড়িয়া উপেন বলিল, "তবে আর কি, একটা মাসের মাইনে পেলেই বড়দিকে মনি-অর্ডার ক'রে পাঠিয়ে দেব। আপনি সে জন্যে কিছু ভাববেন না। আমি তবে চল্লুম এখন।"

উদ্বেগ-ব্যাকুল কণ্ঠে নিস্তারিণী জিজ্ঞাসা করিলেন, "কবে যাবে?"

উপেন বলিল, "কবে কি? আজই যাচ্চি। শুধু এক মুঠো খেতে যা দেরী। খেয়েই বেরিয়ে যাব, দেরী আর কচ্চি না।"

উপেন ব্যস্তভাবে প্রস্থানোদ্যত হইল। উদ্বিগ্নভাবে নিস্তারিণী জিজ্ঞাসা করিলেন, "আবার আসবে তো বাবা?"

ফিরিয়া দাঁড়াইয়া মাথা নাড়িতে নাড়িতে উপেন বলিল, "আসবো বই কি। মাঝে মাঝে এসে দিদিকে দেখে যাব, আপনাদের দেখে যাব। কেন আসবো না? আমি কি কারও ধার ক'রে খেয়ে যাচ্চি? ধারের মধ্যে যা বড়দির দু'টাকা।"

বলিয়া উপেন হাসিতে হাসিতে বাহির হইয়া গেল। নিস্তারিণী একটা দীর্ঘনিশ্বাস ত্যাগ করিয়া স্তব্ধ নিস্পন্দভাবে দাঁড়াইয়া রহিলেন।

মেনী ডাকিল, "মা!"

মায়ের কোন সাড়াশব্দ নাই। তিনি তখন বিশ্বব্রহ্মাণ্ড অন্ধকার দেখিতেছিলেন। দু'পুরের চক্‌চকে রোদের উপর কে যেন একটা ঘন

কালো ছায়া টানিয়া দিয়াছিল। উপেনের প্রস্থানের সঙ্গে কে যেন তাঁহার আশামুগ্ধ হৃদয়টাকে পায়ের তলায় ফেলিয়া নির্ম্মমভাবে পেষণ করিয়া দিতেছিল। হায়, যদিও বহুকষ্টে একটি পাত্র মিলিল, বিধাতার অভিশাপে সেও হাতছাড়া হইয়া যাইতেছে! আর কি উপেন ফিরিবে? আর কি মেনীর পাত্র পাওয়া যাইবে? হা ভগবান, দুঃখীর উপর তুমি এত নির্দ্দয় কেন?

মায়ের সাড়া না পাইয়া মেনী পুনরায় একটু চড়া গলায় ডাকিল, "মা, ও মা, বলি শুন্‌তে পাচ্চো?"

বিরক্তির সহিত নিস্তারিণী উত্তর করিলেন, "কি শুন্‌তে হবে বল্।"

মেনী বলিল, "শুন্‌তে কিছুই হবে না। কিন্তু তুমি অমন ক'রে দাঁড়িয়ে রইলে কেন?"

বিষাদগাঢ়কণ্ঠে নিস্তারিণী উত্তর দিলেন, "আমি কেন দাঁড়িয়ে রয়েছি, তুই আর কি বুঝবি বল্? তুই আবাগী যদি তাড়াতাড়ি ডাক্তার ডাক্‌তে না যাবি—"

তর্জ্জন সহকারে মেনী বলিল, "আমি ডাক্তার ডাকতে না গেলে তোমাকে আজ উঠে দাঁড়াতে হ'তো না।"

নিস্তা। উঠে না দাঁড়াতে হ'তো, আমি পড়েই থাকতাম, কিন্তু উপেনকে দেশ ছেড়ে চলে যেতে হ'তো না।

মেনী। তোমার জন্যে ডাক্তার ডেকে এনেছে ব'লেই বুঝি চ'লে যাচ্ছে?

নিস্তা। নিশ্চয় তাই। বেচারী ডাক্তারকে টাকা দেব বলেছে, অথচ টাকার যোগাড় কত্তে পারে না। তাই মনে ধিক্কার জন্মেছে।

মেনী। হাঁ, তোমাকে বলেছে, ধিক্কার জন্মেছে! ওর মনে সে রাগ থাকলে বোনের ঝাঁটা খেয়ে প'ড়ে থাকে না।

মেয়েকে ধমক দিয়া নিস্তারিণী বলিলেন, "চুপ কর্ আবাগী, ওর বোন ওকে ঝাঁটা মারে, তুই দেখেছিস্?"

জোর গলায় মেনী বলিল, "দেখেছিই তো। এই সে দিন বাজার যেতে দেরী হয়েছিল ব'লে কত কথা শুনিয়ে দিলে, আর ও দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে হাসতে লাগলো।"

ঝঙ্কার দিয়া নিস্তারিণী বলিলেন, "হাঁ, হাসতে লাগলো! আচ্ছা মেনী, তুই তো ঘর ছেড়ে প্রায় কোথাও যাস্ না, তবে এত খবর রাখিস্ কোথা থেকে?"

মেনী বলিল, "এই ঘরে বসেই সব খবর রাখি। এখন তুমি এসে ঝোলে কতটুকু নুণ দেব, দেখিয়ে দিয়ে যাও দেখি।"

নিস্তারিণী বলিলেন, "আমি আবার দেখিয়ে দিতে যাব কেন, এই তো তুই আমায় রান্নাঘর থেকে বা'র ক'রে দিলি।"

যোড়হাত করিয়া ক্রোধসমুচ্চকণ্ঠে মেনী বলিল, "ঝকমারি করেছি গো, ঝকমারি করেছি। এখন এসে নুণটা দেখিয়ে দাও, শেষে নুণ কম-বেশী হয়েছে ব'লে খেতে পারবে না যে।"

মেয়ের কথায় মায়ের হাসি আসিল। হাসি চাপিয়া নিস্তারিণী কৃত্রিম গম্ভীর কণ্ঠে বলিলেন, "আমি খেতে পারি না পারি, তোর তাতে কি বল্ তো?"

মেনী বলিল, "আমার আর কি? তুমি মা, আমি মেয়ে, দু'জনে তো এমন নিকট সম্বন্ধ নয় যে, তোমার ভালয় মন্দয় আমার ক্ষতি-বৃদ্ধি আছে।"

নিস্তারিণী এবার হাসিয়া উঠিলেন; বলিলেন, "আচ্ছা মেনী, এই বয়সে এত কথা তুই শিখলি কোথা থেকে?"

মেনী উত্তর করিল, "তোমার কাছ থেকে।"

"আমার বাপ-চোদ্দপুরুষেও এত কথা জানে না বাছা।" বলিয়া নিস্তারিণী হাসিতে হাসিতে রন্ধনশালায় প্রবেশ করিলেন।

—১১—

মেনীদের বাড়ী হইতে ফিরিয়া উপেন তাড়াতাড়ি স্নান করিয়া আসিল, এবং কুসুমের নিকট গিয়া বলিল, "শীগ্‌গীর ভাত একমুঠো দাও তো দিদি।"

কুসুম জিজ্ঞাসা করিল, "ভাতের এত তাড়া কেন রে?"

উপেন বলিল, "আমাকে ক'লকাতা যেতে হবে।"

কুসু। ক'লকাতায় গিয়ে কি হবে?

উপে। কি আবার হবে! একটা চাকরী-বাকরী দেখতে হবে।

কুসু। কি চাকরী দেখবি? টৌ টৌ কোম্পানীর চাকরী?

ভারীমুখে উপেন বলিল, "কেন, টৌ টৌ কোম্পানীর চাকরী ছাড়া কি আর কিছু চাকরী নাই?"

সহাস্যে কুসুম বলিল, "যাত্রার দলের চাকরী আছে।"

ঘাড় নাড়িয়া উপেন বলিল, "যাত্রার দল! রামঃ, যাত্রার দলে আর যাচ্ছি না।"

ঈষৎ শ্লেষের স্বরে কুসুম জিজ্ঞাসা করিল, "সত্যি?"

রোষগম্ভীর মুখে উপেন বলিল,—"সত্যি নয় তো মিছে? কেন, তোমরা কি মনে কর, যাত্রার দলের চাকরী ছাড়া আর কোন চাকরী আমি কত্তে পারি না?"

মৃদু হাস্য সহকারে কুসুম বলিল, "না না, এমন কথা মনে করবো কেন? তা হ'লে সত্যিই তুই চাকরী কত্তে যাবি?"

উপেন বলিল, "সত্যি মিথ্যে এখনই দেখতে পাবে। আগে ভাত একমুঠো দাও দেখি।"

কুসুম ভাত বাড়িয়া দিল। খাইতে বসিয়া উপেন জিজ্ঞাসা করিল,

"আচ্ছা দিদি, আমি চাকরী কত্তে যাব শুনে তোমার মনে কষ্ট হচ্চে ?"

কুসুম বলিল, "না আহ্লাদ হচ্চে।"

"আহ্লাদ ! সত্যি ?"

"সত্যি।"

"আহ্লাদ হচ্ছে কেন ?"

"পুরুষমানুষ—পয়সা রোজগার করবি, শুনে আহ্লাদ হবে না ?"

"তা বটে" বলিয়া উপেন আহারে মনোনিবেশ করিল। কয়েক গ্রাস ভাত উদরস্থ করিয়া মুখ তুলিয়া জিজ্ঞাসা করিল, "ঘোষজা মশাই কোথায় ?"

কুসুম বলিল, "কোথায় খাজনা সাধ্‌তে গিয়েছে ?"

চিন্তিতভাবে উপেন বলিল, "তাই তো, তা হ'লে যাবার সময় তাঁর সঙ্গে দেখাটা হ'লো না। তিনি কি মনে করবেন।"

ব্যস্ততার সহিত কুসুম বলিল, "কিছু মনে করবেন না। আমি তাঁকে বুঝিয়ে বল্‌বো।"

মাথা নাড়িয়া উপেন বলিল, "তুমি তো বলবে, কিন্তু আমার দেখা না ক'রে যাওয়াটা—তা যাক্‌, ক'লকাতায় গিয়েই তাঁকে একখানা চিঠি লিখবো।"

"তাই লিখে দিস্‌" বলিয়া কুসুম ঘাটে হাত ধুইতে চলিয়া গেল। উপেন আহার শেষ করিয়া উঠিয়া নিজের কাপড়-চোপড় বাঁধিয়া লইল। গিরি জিজ্ঞাসা করিল, "তুমি আবার কবে আসবে মামা ?"

উপেন বলিল, "কবে আসবো, সে কথা এখন কি ঠিক বলা যায় ? তবে দু'চার মাস পরে একবার আসবো।"

এই দুই চারি মাসকে অতি দীর্ঘকাল জ্ঞান করিয়া গিরি বলিল, "ও হরি, দু'চার মাস! আমি বলি বা কাল-পরশু আসবে।"

হাসিতে হাসিতে উপেন বলিল, "আজ গিয়ে কাল-পরশু আসবো, তবে যাচ্ছি কেন?"

গিরি বলিল, "কেন যাচ্চো, তা আমি কি জানি? তা কাল-পরশু না হয়, তিন চার দিন পরেও তো আসতে পার।"

উপেন বলিল, "পারি তো আসবো। নয় ত তোর বিয়ের সময় এসে লুচি খাব।"

বিবাহের কথায় গিরি লজ্জায় ঘাড় হেঁট করিল। উপেন তখন কুসুমকে সম্বোধন করিয়া বলিল, "গিরির বিয়ের সময় আমাকে খবর দিও দিদি।"

গম্ভীর মুখে কুসুম বলিল, "মনে থাকে তো খবর দেব।"

সহাস্যে উপেন বলিল, "মনে থাক্‌লে খবর দেবে? তা হ'লে মনে না থাক্‌তেও পারে বোধ হয়।"

কুসুম বলিল, "সে কথা এখন কি ক'রে বলবো?"

উপেন বলিল, "তা নাই বল্‌তে পার। তোমাদের মনে পড়ে, খবর দিও, না হয়, খবর দিও না। কিন্তু একটা কথা বলি দিদি, রাগ ক'রো না।"

কুসুম জিজ্ঞাসা করিল, "কি এমন কথা বলবি?"

উপেন বলিল, "অপর কিছু কথা নয়, আমি এই যে আজ চ'লে যাচ্ছি, তুমি তো কৈ একবারও বারণ করলে না?"

কুসুম বলিল, "তুই চাকরী কত্তে যাচ্ছিস্, আমি বারণ করবো কেন?"

ঘাড় দোলাইয়া উপেন বলিল, "গেলুম বা চাকরী কত্তে। এই

যে শিবে আজ দশ দিন ক'ল্‌কাতা যাব যাব কচ্চে, কিন্তু তার মা যেতে দেয় না। আজ নয় কাল, দিন ভাল নয়, মঘা—তেরস্পর্শ, এই রকম ক'রে বাধা দিচ্চে।"

একটু ভারী গলায় কুসুম বলিল, "তোরও মা থাক্‌লে তোকে বাধা দিতো।"

দিদির মুখের উপর আগ্রহপূর্ণ দৃষ্টি স্থাপন করিয়া উপেন বলিল, "আমার মা নাই, কিন্তু তুমি তো আছ। তুমি তো একবারও বললে না যে, আজ নয়—কা'ল যাস্‌।"

কুসুমের চোখের পাতাগুলি ভারী হইয়া আসিল। সে উপেনের সকরুণ দৃষ্টির সম্মুখ হইতে মুখ ফিরাইয়া লইয়া ধরা গলায় উত্তর দিল, "তা বল্‌তে পারতাম, কিন্তু বারণ করলে তুই যদি না যাস্‌?"

উপেনের আগ্রহ-প্রফুল্ল মুখখানা হঠাৎ মলিন হইয়া আসিল। সে একটু বেদনাকাতর কণ্ঠে জিজ্ঞাসা করিল, "আমি যদি না যাই,—তা হ'লে আমি চ'লে যাই এই কি তোমার ইচ্ছা দিদি?"

স্বরে একটা অস্বাভাবিক জোর দিয়া কুসুম বলিল, "হাঁ।"

বলিয়াই কুসুম ব্যস্তভাবে তাহার সম্মুখ হইতে সরিয়া গেল। উপেন কাপড়ের পুঁটুলীটা হাতে লইয়া বিস্ময়স্তব্ধভাবে বসিয়া রহিল।

যাত্রাকালে উপেন দিদিকে প্রণাম করিয়া পায়ের ধূলা লইতে গিয়া দেখিল, কুসুমের চোখের কোণে জল টল্‌ টল্‌ করিতেছে। দেখিয়া উপেন বিস্ময়ের সহিত জিজ্ঞাসা করিল, "তুমি কাঁদচো নাকি দিদি?"

ধরা গলায় তর্জ্জন করিয়া কুসুম উত্তর দিল, "হাঁ, কাঁদচি আমি। কাঁদতে যাব আমি কেন রে?"

কথার সঙ্গে সঙ্গেই দুই ফোঁটা জল চোখের কোণ বহিয়া গড়াইয়া

তাহার স্নেহ-হীনতা-সূচক তর্জ্জনকে সম্পূর্ণ নিস্ফল করিয়া দিল দেখিয়া উপেন হাসিতে হাসিতে বাহির হইয়া গেল।

তাহার প্রস্থানের কিয়ৎক্ষণ পরে দয়ারাম বাড়ীতে ফিরিয়া যখন শুনিতে পাইল যে, উপেন হঠাৎ চাকরী করিতে কলিকাতা যাত্রা করিয়াছে, তখনই তিনি মাথায় হাত দিয়া বসিয়া পড়িলেন, এবং কুসুম তাহাকে বাধা দিয়া ধরিয়া রাখে নাই বলিয়া কুসুমকে নির্ব্বোধ বলিয়া তিরস্কার করিতে লাগিলেন; আর কোন দিন কুসুম স্বামীর এরূপ তিরস্কার নীরবে সহ্য করিত কি না সন্দেহ, আজ কিন্তু সে বিনা প্রতিবাদেই আপনার নির্ব্বুদ্ধিতা স্বীকার করিয়া লইল। উপেন চলিয়া যাওয়ায় সে মনের ভিতর খুব কষ্টই অনুভব করিতেছিল বটে, কিন্তু সেই সঙ্গে উপেনের প্রস্থানে উপেনও যে নিজে একটা বিষম লজ্জা ও লাঞ্ছনার হাত হইতে অব্যাহতি লাভ করিয়াছে, এই আনন্দে তাহার হৃদয়টা ভরপূর হইয়া উঠিতেছিল। সুতরাং স্বামীর তিরস্কারের তীব্রতা তাহাকে তেমন কঠোরভাবে আঘাত করিতে পারিল না।

কুসুমের এই নীরব সহিষ্ণুতায় দয়ারামকেও অগত্যা চুপ করিতে হইল। অতঃপর তিনি মেয়েটাকে কিরূপে পার করিবেন, এই চিন্তা লইয়াই ব্যস্ত হইয়া পড়িলেন।

—১২—

"জনমেরি মত বুঝি শ্যামচাঁদ ছেড়ে যায়।
তোরা যাস্‌নে যমুনাকূলে সই লো ফিরিয়ে আয়।"

অর্থোপার্জ্জনের প্রয়োজনীয়তা হৃদয়ঙ্গম করিয়া উপেন অর্থার্জ্জনের আশায় উৎসাহিত চিত্তে বাহির হইল বটে, কিন্তু বাটী হইতে যাইবার পরই তাহার সে উৎসাহ ক্রমেই যেন ম্লান হইয়া আসিতে লাগিল;

তাহার স্থলে স্বজনবিয়োগজনিত একটা বেদনা আসিয়া তাহার মনটাকে নিতান্ত চঞ্চল করিয়া তুলিল। তাহার ধারণা ছিল, সংসারে সে একা, তাহার আপন বলিতে কেহ নাই, কাহারও জন্য তাহার পিছনে চাহিবার প্রয়োজন নাই। আজ কিন্তু তাহার সে ভুল ভাঙ্গিল; উপেন বুঝিতে পারিল, এই কয় বৎসর দিদির বাড়ীতে থাকিবার ফলে অনেকগুলা লোক তাহার আপন হইয়া উঠিয়াছে,—শুধু ভগ্নী ভগ্নীপতি বা ভাগিনেয়ী বলিয়া নয়, সমগ্র গ্রামখানাই যেন তাহার নিতান্ত আপন হইয়া গিয়াছে, এবং আজ হঠাৎ তাহাদিগকে ছাড়িয়া যাওয়া তাহার পক্ষে বড়ই কষ্টকর হইয়া উঠিয়াছে। ইহাদিগকে ছাড়িয়া সে কি থাকিতে পারিবে? বার বার পশ্চাতে দৃষ্টিপাত করিতে করিতে উপেন যতই অগ্রসর হইতেছিল, ততই তাহার পা দুইটা সম্মুখ অপেক্ষা পিছনের দিকেই ফিরিতে যেন ব্যগ্র হইয়া উঠিতেছিল।

কিন্তু ফিরিলে চলিবে না, পয়সার জন্য বিদেশে যাইতেই হইবে। উঃ পয়সার জন্য কি লাঞ্ছনা! দিদি—এক মায়ের পেটের বোন, পয়সা উপায় করিতে পারি নাই বলিয়া সেও কত কথাই শুনাইয়া দিয়াছে। ভগ্নীপতির অন্ন ধ্বংস করে বলিয়া গ্রামের কত লোক কত উপহাস করিয়াছে। না, পয়সা উপায় করিতেই হইবে। দৃঢ় প্রতিজ্ঞায় হৃদয় বাঁধিয়া উপেন ফিরিয়া যাইবার আগ্রহটাকে দমন করিয়া দ্রুতপদে অগ্রসর হইল, এবং গ্রাম ছাড়াইয়া ক্রমে যখন মাঠে গিয়া পড়িল, তখন মনের চাঞ্চল্যকে দূর করিবার জন্য গলা ছাড়িয়া গান ধরিল,—

"জনমেরি মত বুঝি শ্যামচাঁদ ছেড়ে যায়।"

মাঠের পরেই একটী ছোট নদী। গ্রীষ্মকাল বলিয়া নদীতে জল ছিল না, উপেন হাঁটিয়া নদী পার হইয়া পাকা রাস্তা ধরিল।

সেখান হইতে রেল-ষ্টেশন দেড় ক্রোশ মাত্র দূরে। উপেন একবার

পশ্চিম আকাশের দিকে চাহিল। তখনও অনেক বেলা বাকী, গাড়ী সেই সন্ধ্যার সময়। রাস্তার পাশেই একটা বৃহৎ বটগাছ শাখাপ্রশাখা বিস্তার করিয়া ক্লান্ত পথিকদিগের বিশ্রামাগারস্বরূপে দণ্ডায়মান ছিল। উপেন গিয়া সেই বটগাছের ছায়ায় বসিল, এবং পকেট হইতে বিড়ী দেশালাই বাহির করিয়া একটা বিড়ী ধরাইল। বিড়ী টানিতে টানিতে গুন্ গুন্ করিয়া গাহিতে লাগিল,—

"যাস্‌নে যমুনাকূলে সই লো ফিরিয়ে আয়।"

হঠাৎ খক্ খক্ কাসির শব্দে চমকিত হইয়া উপেন গান বন্ধ করিয়া পিছনে ফিরিয়া চাহিতেই দেখিল, একটা মানুষ মোটা চাদরে পা হইতে মাথা পর্য্যন্ত ঢাকা দিয়া শুইয়া রহিয়াছে। মানুষটাকে উপেন এতক্ষণ লক্ষ্য করে নাই, নিজের চিন্তাতেই নিমগ্ন ছিল। এক্ষণে মাঠের মাঝে গাছতলায় মানুষটাকে এইরূপে শুইয়া থাকিতে দেখিয়া সে বিস্মিত হইল, এবং একটু ইতস্ততঃ করিয়া ডাকিল, "কে ওখানে শুয়ে গা?"

প্রথম ডাকে কোনরূপ সাড়াশব্দ পাওয়া গেল না; দ্বিতীয় ডাকে মানুষটা একটু নড়িল, এবং ধীরে ধীরে মুখের আবরণ উন্মোচন করিল। তখন উপেনের বিস্ময় আরও বর্দ্ধিত হইল; দেখিল, চাদর-ঢাকা লোকটা পুরুষ নহে, একজন মেয়েমানুষ এবং তাহার মুখখানা দেখিয়াই বোধ হইল, ভদ্রঘরের মেয়ে, বয়স বোধ হয় ত্রিশের অধিক হইবে না।

উপেন কৌতূহলবিস্ফারিত দৃষ্টিতে স্ত্রীলোকটির মুখের দিকে চাহিয়া রহিল।

স্ত্রীলোকটি ধীরে ধীরে যেন একটু কষ্টে উঠিয়া বসিল এবং সকরুণ-ভাবে উপেনের মুখের উপর দৃষ্টিপাত করিয়া ক্ষীণস্বরে জিজ্ঞাসা করিল, "তুমি কে বাবা?"

উপেন উত্তর করিল, "আমি এক জন রাহী।"

"কোথায় যাবে ?"

"ক'লকাতায়।"

"আমিও ক'লকাতায় যাব। আমাকে সঙ্গে নিয়ে যাবে বাবা ?"

"তা যেতে পারি। তোমার বাড়ী কোথায় ?"

"ক'লকাতায়।"

"ক'লকাতায় বাড়ী ? তুমি এখানে এসেছ কেন ?"

স্ত্রীলোকটি তখন এখানে আসিবার যে কারণ ব্যক্ত করিল, তাহার মর্ম্ম এই,—সে কোন পরিচিত আত্মীয়ের সহিত নন্দীগ্রামে গোপীনাথের দোলযাত্রা দেখিতে আসিয়াছিল। সেখানে আসিয়া সে পথের পরিশ্রমেই হউক বা পল্লীগ্রামের জল-বায়ুর দোষেই হউক, প্রবল জ্বরে আক্রান্ত হইয়া পড়ে। সেই অবস্থায় একদিন রাত্রে সে যখন জ্বরে অজ্ঞান হইয়া পড়িয়া ছিল, তখন তাহার সঙ্গী আত্মীয়টি তাহার সঙ্গের অর্থ ও গাত্রস্থিত দুই একখানি অলঙ্কার লইয়া কোথায় চলিয়া গিয়াছে। স্ত্রীলোকটির কানে দুইটি সোনার ফুল ছিল। সঙ্গীটী বোধ হয় তাহা লক্ষ্য করে নাই, বা লইবার অবসর পায় নাই। সেই ফুল দুইটি আট টাকায় বিক্রয় করিয়া সে নিজের চিকিৎসা ও পথ্যের খরচ চালাইয়াছে। তার পর একটু সুস্থ হইয়া কলিকাতায় যাইতেছে। তাহার হাতে এমন পয়সা আর নাই যে, গরুর গাড়ী ভাড়া করিয়া ষ্টেশন পর্য্যন্ত যায়, মাত্র রেল-ভাড়াটি রহিয়াছে। কাজেই তাহাকে নন্দীগ্রাম হইতে হাঁটিয়া আসিতে হইতেছে. এবং হাঁটিতে হাঁটিতে ক্লান্ত ও চলচ্ছক্তিরহিত হইয়া সে এই গাছতলায় শুইয়া পড়িয়াছে।

তাহার এই দুঃখের কাহিনী শুনিয়া উপেন একটু ব্যথিত হইল। সে ভ্রূকুটী করিয়া বলিল, "তোমার আত্মীয়টি তা হ'লে তো চমৎকার আত্মীয় !"

স্ত্রীলোকটি বলিল, "তেমন আপনার লোক হ'লে কি এই রকম ক'রে পালায় বাবা ?"

উপেন বলিল, "কিন্তু এ-রকম লোকের সঙ্গে তোমার আসাও উচিত হয় নি।"

স্ত্রীলোকটি নিজের নাক-কান মলিয়া বলিল, "এই নাকে কানে খৎ বাবা, আর যদি কারও সঙ্গে ঘরের বাইরে পা দিই। এখন একবার কোন রকমে ঘরে পৌঁছুতে পারলে হয়।"

উপেন জিজ্ঞাসা করিল, "ষ্টেশন পর্য্যন্ত হাঁটতে পারবে তো ?"

স্ত্রী। আর কতটুকু রাস্তা যেতে হবে ?

উপেন। প্রায় ক্রোশ-খানেক।

স্ত্রী। হাঁটবার ক্ষমতা আমার নাই, কিন্তু মাঠের মাঝেও তো প'ড়ে থাকতে পারবো না। মরি বাঁচি—যেতেই হবে।

মুখে 'যেতেই হবে' বলিলেও সে যাইতে পারিবে কি না, সে বিষয়ে উপেনের সন্দেহ জন্মিল ; এবং কিরূপে এই বিপন্ন স্ত্রীলোকটিকে ষ্টেশনে লইয়া যাইবে, তাহাই ভাবিয়া একটু ব্যাকুল হইয়া পড়িল।

ভগবান্ উপায় করিয়া দিলেন। একখানা খালি গরুর গাড়ী মাল আনিবার জন্য ষ্টেশনের দিকে যাইতেছিল। উপেন গাড়োয়ানের কাছে গিয়া অনেক অনুনয়-বিনয় করিয়া, শেষে নিজ হইতে দুই আনা জলপানি দিতে স্বীকৃত হইয়া এই স্ত্রীলোকটিকে ষ্টেশনে পৌছাইয়া দিতে গাড়োয়ানকে সম্মত করাইল। তার পর স্ত্রীলোকটিকে গাড়ীতে উঠাইয়া দিয়া নিজে গাড়ীর পিছনে পিছনে চলিল।



কয়েকদিন পরে উপেনের পত্র আসিল। সে লিখিয়াছে,—

"ঘোষজা মশাই, আমি ক'লকাতায় এসে পৌছেছি। রাস্তায় এক বিপন্ন স্ত্রীলোককে নিয়ে ভারী ব্যস্ত হয়ে পড়েছিলাম, অনেক কষ্টে তাঁকে তাঁর ঘরে এনে দিয়েছি। আমি এখন তাঁদের বাড়ীতেই আছি, খাওয়া দাওয়ার খরচ তাঁরাই সব দিচ্চেন। চাকরীর যোগাড় এখনও হয়ে ওঠে নি। থিয়েটারে চাকরী করলে আজই চাকরী হয়, কিন্তু ও-সব কাজ আর করবো না। অন্য কাজের চেষ্টা দেখচি। গিরি, খোকা ও আপনারা কেমন আছেন লিখবেন। বড়দিকে বল্‌বেন, আমি বেশ ভাল আছি, এখানে আমার কোনই কষ্ট হচ্চে না। ইতি।"

দয়ারাম স্ত্রীকে ডাকিয়া বলিল, "শুন্‌চো গা, উপেন বাবুর পত্র এসেছে।"

কুসুম একটু আগ্রহের সহিত জিজ্ঞাসা করিল "কি লিখেছে?"

দয়ারাম বলিল, "লিখেছে ভাল—কোথাকার কাদের বাড়ীতে খাচ্চে দাচ্চে রয়েছে। চাকরী এখনও হয় নি, চেষ্টা দেখছে।"

কুসুম বলিল, "তা চেষ্টা দেখতে হবে বৈ কি। চাকরী কি অম্নি প'ড়ে রয়েছে।"

একটু উপহাসের হাসি হাসিয়া দয়ারাম বলিল, "চাকরী পড়েও নাই, আর চাকরী ও কত্তেও পারবে না। তুমি দেখে নিও।"

কুসুম বলিল, "কত্তে পারবে না তো গেল কেন?"

গম্ভীর মুখে দয়ারাম বলিল, "গিয়েছে দায়ে প'ড়ে; স্বেচ্ছায় তো যায় নি।"

স্বামীর এই উক্তির মধ্যে কুসুমের উপর যে একটু তিরস্কারের

আঘাত আছে, তাহা অনুভব করিয়া কুসুম ঈষৎ রাগতভাবে বলিল, "স্বেচ্ছায় যায় নি তো কে তাকে অনিচ্ছায় ধ'রে বেঁধে পাঠিয়ে দিয়েছে ?"

গম্ভীরভাবে মস্তকসঞ্চালন পূর্ব্বক দয়ারাম বলিল, "ধ'রে বেঁধে কেউ পাঠায় নি, তবে উপেন এখানে থাকে বা তার দ্বারায় আমার কোন উপকার হয়, এ ইচ্ছা অনেকেরই নাই।"

কুসুম ভারীমুখে নীরবে দাঁড়াইয়া রহিল। দয়ারাম তাহার দিকে তীব্র দৃষ্টি নিক্ষেপ করিয়া যেন একটু তাচ্ছীল্যের স্বরেই বলিল, "চুলোয় যাক্, সে এখানে থেকে আমাকে রাজা করেনি, চ'লে গিয়ে কাঙালও করবে না। তবে অনাথ অসহায়—তাই যত্ন-আত্তি ক'রে রেখেছিলাম, তাতে যদি কারও আপত্তি থাকে, আমার টানাটানিতে দরকার কি ? আমার মেয়ের বিয়ে—উপেনের জন্যে সে কাজ আটকাবে না, এক রকমে মেয়ে পার হয়েই যাবে।"

স্বামীর এই আক্ষেপোক্তিতে ক্রুদ্ধ হইয়া কুসুম বলিল, "তা হ'লে তুমি কি মনে কর, উপেনকে আমিই তাড়িয়েছি ?"

ভ্রূ কুঞ্চিত করিয়া দয়ারাম বলিল, "তুমি তাড়িয়েছ, এমন কথা আমি বলি না। তবে তোমার ভাই, তার ভাল মন্দ তুমি যতটা বুঝবে, অপরে কি তত বোঝে ? সে দু'পয়সা রোজগার করবে, বিয়ে-থা ক'রে সংসারী হবে, এ ইচ্ছা তোমার হ'তেই পারে তো।"

রোষক্ষুব্ধ-কণ্ঠে কুসুম বলিল, "যদিই আমার সে ইচ্ছা হ'য়ে থাকে, তবে সেটা কি খুব অন্যায় হয়েছে ? তোমারও কি সে ইচ্ছা নাই ?"

দুঃখ-মলিনস্বরে দয়ারাম বলিল, "আমার ইচ্ছা ছিল কি না, সে কথা ভগবানই জানেন। কিন্তু থাকলে কি হবে, হাজার হোক আমি পর ; আমি যেটা ভালোর জন্যে করবো, অপরের কাছে সেটা মন্দ হ'য়ে দাঁড়াবে।"

দয়ারাম আক্ষেপে একটা ক্ষুদ্র নিশ্বাস ত্যাগ করিল। কুসুম আরক্ত মুখে জোর গলায় বলিল, "দেখ, তুমি যাই মনে কর, আমি কিন্তু উপেনকে যাবার কথা একবারও বলি নাই। সে নিজেই—"

তাহার কথায় বাধা দিয়া দয়ারাম বলিল, "সে নিজে যায়নি তো তুমি কি তাকে জোর ক'রে পাঠিয়েছো? সে নিজেই গিয়েছে, তবে তুমি তাকে মানা করনি। আর রাহাখরচ—"

কুসুম বলিল, "রাহাখরচ কে দিয়েছে জান? ও বাড়ীর বড়দি দিয়েছে।"

উৎসুকভাবে দয়ারাম জিজ্ঞাসা করিল, "কে দিয়েছে? নীলু-দার স্ত্রী?"

"হাঁ।"

"ওঃ, ভিতরে তা হ'লে আরও গলদ আছে।"

কুসুম জিজ্ঞাসা করিল, "গলদ আবার কি?"

"পরে জানতে পারবে" বলিয়া দয়ারাম উপেনের চিঠিখানা চালের বাতায় গুঁজিয়া রাখিয়া চটীজুতাটা পায়ে দিয়া বাহির হইয়া গেল।

দয়ারাম রাগে রাগেই মেনীর মা'র নিকট উপস্থিত হইল, এবং নিতান্ত দুঃখের সহিত তাহাকে জানাইল যে, উপেনের সহিত মেনীর বিবাহ দিয়া তাঁহাকে কন্যাদায় হইতে উদ্ধার করিয়া দেওয়া দয়ারামের অভিপ্রেত ছিল বটে, কিন্তু তাহা এক্ষণে ঘটিয়া উঠা অসম্ভব। কারণ, উপেন কলিকাতা চলিয়া গিয়াছে; সে আর ফিরিবে কি না সন্দেহ; ফিরিলেও চাকরী করিয়া দুই পয়সা উপার্জ্জন করিলে সে মেনীকে বিবাহ করিতে সম্মত হইবে না। সুতরাং তাহার অপেক্ষায় মেয়ে রাখা যায় না। উপস্থিত মেনীর মা যদি দ্বিতীয় পক্ষে মেয়ে দিতে সম্মত হয়, তাহা হইলে দয়ারাম চেষ্টা দেখিতে পারে। দ্বিতীয় পক্ষের পাত্র একটি

সন্ধানে আছে বয়স যে খুব বেশী, তা নয়, চল্লিশের মধ্যে। এ দিকে অবস্থা খুব ভাল, এবং অল্প-স্বল্প কিছু দিলেই কার্য্য সম্পন্ন হইয়া যাইবে।

নিস্তারিণী অগত্যা ইহাতেই সম্মতি দিতে বাধ্য হইলেন; বলিলেন, "দ্বিতীয় পক্ষই হোক, আর তৃতীয় পক্ষই হোক, কোন রকমে মেয়েটাকে পার ক'রে দাও ঠাকুরপো, আমি তো আর পাঁচজনের পাঁচ কথা শুন্‌তে পারি না।"

দয়ারাম তাঁহাকে আশ্বাস দিয়া বলিল, "তৃতীয় পক্ষ চতুর্থ পক্ষ দেখতে হবে না, দ্বিতীয় পক্ষই যোগাড় ক'রে দিচ্ছি। লোকের কথা ছেড়ে দাও, তারা ভাল কারও দেখতে পারে না। নইলে উপেনকে যুক্তি দিয়ে, রাহাখরচ দিয়ে ক'লকাতা পাঠিয়ে দেবে কেন? তা হোক, উপেন ছাড়া দেশে ঢের পাত্র আছে। মেয়েও তো বুড়ো হয়ে যায় নি, তেরো বছরে পা দিয়েছে মাত্র। আজকাল বড় বড় ঘরে ষোল আঠার বছরের আইবুড়ো মেয়ে থাকে।"

নিস্তারিণী বলিলেন, "বড় ঘরের বড় কথা ছেড়ে দাও ঠাকুরপো, আমাদের গরীবের ঘরে গরীবের মতই চলতে হবে।"

দয়ারাম বলিল, "আচ্ছা আচ্ছা, সে জন্যে তোমাকে ব্যস্ত হ'তে হবে না, আমি যত শীগ্‌গীর পারি, কাজ সেরে দিচ্ছি। আগে মেনীর বিয়ে দিয়ে তবে আমি গিরির বিয়ের চেষ্টা করবো।"

নিস্তারিণীকে অভয় দিয়া দয়ারাম সেই দিনই মেনীর জন্য পাত্র অন্বেষণে বাহির হইলেন।

পাত্র একপ্রকার দেখাই ছিল। যাদববাটীর মধুসূদন ঘোষ পঞ্চাশ বৎসরে বিপত্নীক হইয়া বংশরক্ষার্থে দ্বিতীয়বার দারপরিগ্রহে ব্যস্ত হইয়া উঠিয়াছিলেন। দয়ারাম সে সংবাদ রাখিতেন। সুতরাং সে গিয়া

প্রস্তাব করিবামাত্র মধুসূদন স্বীকৃত হইলেন এবং পাত্রী বয়স্থা ও মনোনীতা হইলে এক পয়সাও গ্রহণ করিবেন না, ইহা মুক্তকণ্ঠে স্বীকার করিলেন। তবে তিনি পাত্রী দেখিতে চাহিলেন। দয়ারাম একটু বিপন্ন হইয়া পড়িল। বিপন্ন হইলেও তাহাকে ইহাতে স্বীকৃত হইতে হইল। তবে সে কৌশলে কার্য্যোদ্ধারের অভিপ্রায়ে মধুসূদনকে বুঝাইয়া দিল যে, তিনি নিজে পাত্রী দেখিতে গেলে নানা কথা উঠিতে পারে, সুতরাং এক সময়ে গোপনে গিয়া মেয়েটিকে দেখিয়া আসিবেন। মধুসূদনের ইহাতে আপত্তি রহিল না, বরং দয়ারামের যুক্তিই তিনি শ্রেয়ঃ বলিয়া মানিয়া লইলেন।

তার পর একদিন মধুসূদন পাত্রী দেখিতে উপস্থিত হইলেন। দয়ারামের সৌভাগ্যক্রমে মেনী সে দিন গৌরীদের বাগানে গৌরীর সহিত খেলা করিতেছিল। দয়ারাম দূর হইতে অঙ্গুলি নির্দ্দেশ করিয়া দেখাইয়া দিলেন, "ঐ মেয়েটি।"

কোন মেয়েটি, তাহা স্পষ্ট না বলিলেও মধুসূদন গৌরীকে দেখিয়াই সন্তুষ্ট হইলেন, এবং পাত্রী পছন্দ হইয়াছে বলিয়া স্বীকার করিয়া গেলেন। দয়ারাম তখন নিস্তারিণীকে মেয়ের বিবাহের উদ্যোগ করিতে বলিলেন, এবং জমী বন্ধক দিয়া তিন শত টাকার যোগাড় করিতে উপদেশ দিলেন। দ্বিতীয় পক্ষ বলিয়াই এত অল্প টাকায় হইয়াছে, নতুবা যেরূপ অবস্থাপন্ন পাত্র, তাহাতে হাজার টাকা দিলেও এমন পাত্র পাওয়া যায় কি না সন্দেহ।

নিস্তারিণী দয়ারামের নিকট কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করিয়া জমীর ক্রেতার অন্বেষণ করিতে লাগিলেন। এ দিকে দয়ারামও স্বীয় কন্যার জন্য পাঁচ শত টাকায় একটি এণ্ট্রান্স-পাশ পাত্র স্থির করিয়া ফেলিলেন।

—১৪—

"কেমন ছবি এঁকেছি, দেখ দেখি উপীনদা!"

ছবিখানিতে তেমন বৈচিত্র্য কিছু ছিল না; গ্রামের পাশ দিয়া একটী নদী বহিয়া যাইতেছে, আর নদীর জলে পদ্ম, কুমুদ, কহ্লার ফুটিয়া রহিয়াছে। বাতাসে নদীর জলে মৃদু তরঙ্গ উত্থিত হইতেছে, ফুলগুলি দুলিয়া দুলিয়া জলের দিকে ঝুঁকিয়া পড়িতেছে; কয়েকটী ভ্রমর আসিয়া ফুলের উপর উড়িয়া বেড়াইতেছে, কিন্তু ফুলগুলি বায়ুবশে দোদুল্যমান হওয়ায় তাহাদের উপর বসিতে পারিতেছে না। নদীর তীরে শ্রেণীবদ্ধ বৃক্ষরাজির হরিৎপল্লবে অস্তোন্মুখ সূর্য্যের সুবর্ণরশ্মি পতিত হইয়া বৃক্ষপত্রগুলিকে রঞ্জিত করিয়া দিয়াছে। উপেন ছবিখানি হাতে লইয়া, ছবির সৌন্দর্য্য অপেক্ষা এমন সুন্দর ছবিখানি যে আঁকিয়াছে, তাহার সৌন্দর্য্যজ্ঞান ও নৈপুণ্য কতদূর, মুগ্ধচিত্তে তাহাই ভাবিতে লাগিল।

ছবিখানি আঁকিয়াছিল, বাড়ীওয়ালীর মেয়ে নলিনী। উপেন কলিকাতা আসিবার সময় পথে যে বিপন্না রমণীকে দেখিয়া, সঙ্গে লইয়া কলিকাতায় আসিয়াছিল, তিনিই এই বাটীর অধিকারিণী। তিনি যে কোন্ শ্রেণীর রমণী ইহা উপেন পূর্ব্বে বুঝিতে পারে নাই বুঝিতে পারিলেও সে যে সাহায্য দানে পরাঙ্মুখ হইত তাহা নহে; কেন না পতিতা রমণীকে সাহায্য প্রদান নীতিশাস্ত্র-বিরুদ্ধ, এতটা নীতিজ্ঞান উপেনের ছিল না। তবে এখানে আসিবার পর যখন রমণীর পরিচয় জানিতে পারিল, তখন এই স্থানে থাকিতে তাহার মনটা যেন কেমন কেমন করিতে লাগিল। করিলেও সে কিন্তু এ স্থান ত্যাগ করিয়া যাইতে পারিল না। এই পতিতা রমণীর মাতৃবৎ স্নেহব্যাকুলতায়

মুগ্ধ হইয়া এই স্থান ত্যাগ করিয়া যাইবার প্রবৃত্তি বা শক্তি তাহার রহিল না।

বেশ্যা হইলেও বাড়ীতে বেশ্যার ন্যায় আচার ব্যবহার কিছুই ছিল না, ঠিক যেন ভদ্র গৃহস্থের বাড়ী। বাড়ীতে মা, মেয়ে, একটি ঝি, একজন বেহারী চাকর। মা থিয়েটারে কাজ করিত, মোটা মাহিনা পাইত। মেয়ে নলিনী বেথুন স্কুলে পড়িতে যাইত। একজন উড়ে বামুন আসিয়া দুই বেলা রাঁধিয়া দিয়া যাইত। উপেন যে কয়দিন এখানে আসিয়াছিল, সেই কয়দিনের মধ্যে একদিনও এই উড়ে বামুন ছাড়া আর কোন পুরুষ মানুষকে বাটীর মধ্যে প্রবেশ করিতে দেখে নাই। শুধু শনি রবিবারে একজন বাবু থিয়েটারের গাড়ী লইয়া আসিয়া দরজায় দাঁড়াইত।

হাবড়া হইতে গাড়ী করিয়া রমণীকে বাড়ীর দরজায় পৌঁছাইয়া দিয়া উপেন চলিয়া যাইতে উদ্যত হইলে রমণী তাহাকে জিজ্ঞাসা করিল, "তুমি কোথায় যাবে বাবা ?"

উপেন একটু ইতস্ততঃ করিয়া উত্তর করিল, "কোথায় যাব তার ঠিক নাই। তবে বৌবাজারে আমাদের দেশের একজন লোক থাকে, আজ সেইখানেই যাব মনে কচ্চি।"

"তার ঠিকানা কি ?"

"ঠিকানা—ঠিকানা বৌবাজার।"

রমণী ঈষৎ হাসিয়া জিজ্ঞাসা করিল, "তুমি এর আগে কতবার ক'লকাতায় এসেছ ?"

উপেন বলিল, "বার দুই।"

রমণী বলিল, "তা হ'লে আজ আর তোমার দেশের লোকের কাছে গিয়ে কাজ নাই, গেলে বিপদে পড়বে। আজ এইখানেই থাক, কাল তখন যা হয় করবে।"

বলিয়া সে উপেনের উত্তরের অপেক্ষা না করিয়াই তাহার হাত ধরিয়া বাড়ীর মধ্যে প্রবিষ্ট হইল; উপেন ঠিক যন্ত্রচালিতের ন্যায় নিশ্চেষ্টভাবে তাহার অনুসরণ করিল। সিঁড়ি বহিয়া উপরে উঠিয়াই রমণী ডাকিল, "নলি, নলি!"

সম্মুখের ঘরের ভিতর একটী চোদ্দ পনেরো বছরের মেয়ে টেবিলের পাশে বসিয়া ছবি আঁকিতেছিল। উপেন বিস্ময়চকিত দৃষ্টিটা বিস্ফারিত করিয়া চাহিয়া দেখিল, যেন একরাশ টাট্‌কা গোলাপফুল দিয়া গড়া একটী সজীব মূর্ত্তি! চোদ্দ পনেরো বছরের সুন্দরী মেয়ে উপেন অনেক দেখিয়াছে, কিন্তু এমন অসাধারণ সৌন্দর্য্য তাহার চোখে কোন দিনই পড়ে নাই। এ সৌন্দর্য্য যেন কোন্ এক নূতন বিধাতার হাতের অপূর্ব্ব সৃষ্টি! উপেন মুগ্ধ অপলক নেত্রে মেয়েটির দিকে চাহিয়া রহিল।

মেয়েটি টেবিলের উপর কনুইএর ভর দিয়া, বাম করতলের উপর গণ্ডদেশ স্থাপন করিয়া নিবিষ্টচিত্তে ছবি আঁকিতেছিল, মায়ের ডাক শুনিয়া চমকিত ভাবে মুখ তুলিয়া চাহিল, এবং "মা মা" বলিতে বলিতে আলুথালু বেশে ঊর্দ্ধশ্বাসে ছুটিয়া আসিয়া মায়ের সম্মুখে দাঁড়াইল, কিন্তু সম্মুখবর্ত্তী হইয়াই উপেনকে দেখিয়া যেন একটু সঙ্কুচিত হইয়া পড়িল। তখন রমণী তাহাকে সম্বোধন করিয়া বলিল, "আমার সঙ্গে কে আছে দেখেছিস্ নলি? এ কে বল্ দেখি?"

নলিনী আশ্চর্য্যান্বিত ভাবে উপেনের মুখের দিকে চাহিল। মা তখন মেয়ের বিস্ময় অপনোদন করিবার অভিপ্রায়ে বলিল, "এ আমার একটী কুড়ানো ছেলে,—রাস্তায় কুড়িয়ে পেয়েছি।"

হর্ষপ্রফুল্ল মুখে নলিনী জিজ্ঞাসা করিল, "সত্যি মা?"

মা হাসিয়া বলিল, "সত্যি নয় তো তোর কাছে কি মিছে বলছি

একে ঘরে নিয়ে যা। জুম্মন কোথায় গেল? তাকে শীগ্‌গীর খাবার আন্‌তে বল্‌। আমি কলে পা হাত ধুয়ে আসি।"

বলিয়াই সে পুনরায় নীচে নামিয়া গেল। উপেন তাহার সঙ্গে নীচে নামিয়া যাইবে, অথবা সেইখানেই দাঁড়াইয়া থাকিবে ইহা স্থির করিবার পূর্ব্বেই নলিনী আসিয়া খপ্‌ করিয়া তাহার হাতখানা ধরিয়া ফেলিল। ইহার জন্য উপেন কিছুমাত্র প্রস্তুত ছিল না, সুতরাং এই আকস্মিক স্পর্শে উপেন যেন কিংকর্ত্তব্যবিমূঢ় হইয়া পড়িল। লজ্জা সঙ্কোচে তাহার চোখ মুখ লাল হইয়া উঠিল, নলিনী সেই অবস্থাতেই তাহাকে ঘরের ভিতর টানিয়া আনিয়া একখানা সোফার উপর বসাইয়া দিল।

তারপর মা আসিয়া উপেনের সম্মুখেই মেয়ের কাছে নিজের বিপদ্‌বৃত্তান্ত এবং উপেনের সাহায্যের কথা বর্ণনা করিলে, তখন নলিনী কাঁদিতে কাঁদিতে উপেনের হাত দুইটা জড়াইয়া ধরিয়া গদগদকণ্ঠে বলিল, "তুমি আমাদের যে উপকার করেছ উপীনদা, তার প্রত্যুপকার আমার জীবন দিলেও হবে না।"

উপেন লজ্জারক্তমুখে নিঃশব্দে বসিয়া এই মাতাপুত্রীর অপূর্ব্ব কৃতজ্ঞ ব্যবহারের কথা ভাবিতে লাগিল।

পরদিন সকালে উপেন চলিয়া যাইবার উপক্রম করিলে নলিনী আসিয়া বাধা দিয়া বলিল, "তা হবে না উপীনদা, আজ তোমাকে কক্ষনো যেতে দেব না, অন্ততঃ দশটা দিনও এখানে থাক্‌তে হবে।"

নলিনীর এই সাগ্রহ অনুরোধের উত্তরে উপেন কি বলিবে ভাবিয়া পাইল না। এই সরলা বালিকার এরূপ সস্নেহ অনুরোধ ঠেলিয়াও যাওয়া যায় না, অথচ এখানে থাকাই হয় বা কিরূপে? কর্ত্তব্য কি স্থির করিতে :না পারিয়া উপেন যেন ব্যাকুল হইয়া পড়িল। নলিনীর মা আসিয়া তাহাকে এই ব্যাকুলতা হইতে মুক্তি দিল; সে বলিল,

"তোমাকে ছেড়ে দিতে ইচ্ছা হয় না বাবা. তোমাকে দেখে পর্য্যন্ত তোমার উপর কেমন একটা মায়া জন্মে গিয়েছে। অথচ তোমাকে থাকতেও বলতে পারি না, বলবার অধিকার আমার নাই। কেন না, বুঝতে পেরেছ বোধ হয়, আমি বেশ্যা।"

শ্রদ্ধাগদগদ কণ্ঠে উপেন বলিল, "তুমি যেই হও, আমার মা।"

স্নেহপ্রোজ্জ্বল নেত্রে তাহার মুখের দিকে চাহিয়া নলিনীর মা বলিল, "তাই যদি যথার্থ মনে কর বাবা, তা হ'লে কক্ষনো তুমি যেতে পাবে না। মা পতিতা হ'লেও মা, মায়ের অন্ন খেয়ে ছেলে কখন পতিত হয় না।"

উপেন ইহার আর প্রতিবাদ করিতে পারিল না। তখন নলিনীর মা বলিল, "তোমার চাকরীর ভার আমার রইলো। থিয়েটারে চাকরী, আজই ক'রে দিতে পারি, কিন্তু না, থিয়েটারে কাজ নাই, আমি তোমাকে ভাল চাকরীই ক'রে দেব।"

উপেন আপাততঃ সেইখানেই রহিয়া গেল। নলিনীর মা তাহার জন্য একখানি স্বতন্ত্র ঘর ছাড়িয়া দিল। উপেন বামুন রাঁধা ভাত খাইয়া নলিনীর সহিত গল্প করিয়া ও তাহার গল্প শুনিয়া, স্বচ্ছন্দচিত্তে দিনতিপাত করিতে লাগিল। চাকরীর কথা তাহার মনেও রহিল না; নলিনীর মাতার পুত্রাধিক স্নেহযত্ন, নলিনীর সোদরবৎ ব্যবহার তাহাকে এমনই মুগ্ধ করিয়া ফেলিল যে, ইহাদিগকে ছাড়িয়া অন্যত্র যাইবার কথা সে ভাবিতে পারিল না।

উপেনকে সর্ব্বাপেক্ষা অধিক মুগ্ধ করিল, নলিনীর ব্যবহার। সে চোদ্দ পনেরো বছরের মেয়ে অনেক দেখিয়াছে, এবং তাহাদের অস্বাভাবিক লজ্জাজনিত জড়তা দেখিয়া নিজেও অনেক সময় সঙ্কুচিত হইয়া ভাবিয়া লইয়াছে, এত বড় মেয়ের সঙ্গে কথা কহিতে বা তাহার

সম্মুখীন হইতে নাই। কিন্তু নলিনীকে দেখিয়া তাহার সে ভ্রম দূর হইল। এই তো চোদ্দ পনেরো বছরের মেয়ে, ইহারও লজ্জা আছে, কিন্তু তাহাতে অস্বাভাবিকতা নাই, সঙ্কোচ আছে, কিন্তু তাহাতে সে জড়তা নাই। ইহার সহিত মুখামুখী হইয়া কথা কহিতে কিছুমাত্র সঙ্কোচ হয় না, হাসিয়া কথা কহিলে ভয়ে ছুটিয়া পলায় না। এত বড় মেয়ে—কাছে বসিয়া কেমন অসঙ্কুচিতচিত্তে গল্প করে, হার্ম্মোনিয়ম বাজাইয়া গান শোনায়, সহোদরার মত স্নেহযত্ন দেখাইয়া অপ্রফুল্ল চিত্তকে প্রফুল্ল করিয়া তোলে। এইটুকু মেয়ের মনে কি উদারতা, কি গভীর স্নেহ! অকালপক্ক বালিকাদের মত গৃহিণীপণা প্রদর্শন না করিলেও অপরের সুখ স্বাচ্ছন্দ্য বিষয়ে কি অসাধারণ নৈপুণ্য প্রদর্শন করে! বাস্তবিক, নলিনীর মত মেয়ে যেখানে আছে, সেখানে সুখশান্তির একাধিপত্য। কিন্তু হায়, এই নলিনী যদি গৃহস্থের উদ্যান-সরোবরে প্রস্ফুটিত হইত!

নলিনীর সরল মধুর ব্যবহারে মুগ্ধ হইয়া পড়িলেও উপেন তাহার পরিণাম স্মরণে দীর্ঘনিশ্বাস ত্যাগ না করিয়া থাকিতে পারিত না।



অপরাহ্ণে নিজের ঘরখানিতে বসিয়া উপেন অন্যান্য কথার সঙ্গে নলিনীর পরিণামের কথাই ভাবিতেছিল, এমন সময় নলিনী চঞ্চলা হরিণীর ন্যায় অস্থিরপদে তথায় উপস্থিত হইল, এবং ছবির খাতাখানা খুলিয়া উপেনের সম্মুখে রাখিয়া বলিল, "কেমন ছবি এঁকেছি, দেখ দেখি উপীনদা!"

উপেন অনেকক্ষণ পর্য্যন্ত নিবিষ্টচিত্তে ছবিখানি দেখিয়া দেখিয়া প্রশংসা-প্রফুল্ল কণ্ঠে বলিল,—"সুন্দর হয়েছে।"

এই প্রশংসায় নলিনীর মুখমণ্ডল সার্থকতার আনন্দে উজ্জ্বল হইয়া উঠিল। সে ছবিখানির উপর আগ্রহপূর্ণ দৃষ্টি নিবদ্ধ করিয়া, ঘাড়টা একটু হেলাইয়া ঈষৎ আবদারের সুরে বলিল, "শুধু সুন্দর হ'য়েছে বললেই চলবে না।"

সহাস্য দৃষ্টিতে তাহার মুখের দিকে চাহিয়া উপেন বলিল, "তবে কি খারাপ হ'য়েছে বলবো ?"

মাথা দোলাইয়া নলিনী বলিল, "তা কেন, কোনখানে কিছু খুঁৎ হ'য়েছে কিনা তাই বল।"

ঈষৎ হাসিয়া উপেন বলিল, "এতখানি সুন্দরের মধ্যে কোথায় একটু খুঁৎ আছে, সেটা ধরবার শক্তি আমার তো নাই নলিনী।"

অভিমানে ঠোঁট ফুলাইয়া নলিনী বলিল, "শক্তি নাই বৈকি, বলবে না তাই বল ?"

বলিয়া নলিনী অভিমানে মুখখানা ঘুরাইয়া লইল দেখিয়া উপেন বলিল, "আচ্ছা থাম, ভাল ক'রে দেখি।"

উপেন পুনরায় কিয়ৎক্ষণ ছবিখানির সর্ব্বত্র দৃষ্টি সঞ্চালিত করিয়া বলিল, "দোষ এবার ধরেছি নলিনী।"

উৎসুক ভাবে নলিনী জিজ্ঞাসা করিল, "কি দোষ হ'য়েছে ?"

উপেন বলিল, "তুমি নদীতে পদ্মফুল এঁকেছ, কিন্তু বাস্তবিক নদীতে পদ্মগাছ জন্মে না।"

বিস্ময়ের সহিত নলিনী বলিল, "জন্মে না ? কেন, অনেক বইএ তো পড়েছি।"

উপেন হাসিয়া বলিল, "বইএ পড়তে পার, কিন্তু প্রকৃতপক্ষে নদীতে পদ্ম বা শালুক গাছ জন্মে না, জন্মাতে পারে না। পুকুর খাল বিল এই সকলেই জন্মে থাকে।"

নলিনী বলিল, “পুকুরের জলে জন্মাতে পারে, আর নদীর জলেই বা পারে না কেন?”

উপেন তখন নদীতে পঙ্কের অভাব ও স্রোতের জন্য পদ্ম বা কুমুদ-কহ্লারাদির উৎপত্তির অসম্ভাব্যতা বুঝাইয়া দিয়া নলিনীর ভ্রমসংশোধন করিল। নলিনী বুঝিতে পারিয়া ঈষৎ লজ্জিতভাবে বলিল, “এত তত্ত্ব কে জানে বল, বইএ যেমন পড়েছি তেমনি এঁকেছি। তা হ’লে দেখছি, প্রাকৃটিক্যাল নলেজ (বাস্তব জ্ঞান) না থাকলে শুধু বই পড়ে ছবি আঁকা ঠিক হয় না।”

উপেন বলিল, “সে কথা ঠিক। ছবির সম্বন্ধে আমার তেমন জ্ঞান নাই, তবে এটুকু বলতে পারি যে, যে জিনিষটা আঁকতে হবে, সেটাকে চোখে দেখা চাই।”

একটু ভাবিয়া নলিনী বলিল, “কোথায় গেলে এ সব চোখে দেখা যায় উপীনদা?”

উপে। পাড়াগাঁয়ে গেলেই দেখতে পাবে।

নলি। তোমাদের দেশ তো পাড়াগাঁ?

উপে। হাঁ, পাড়াগাঁ বৈ কি।

নলি। তা’ হলে তোমাদের দেশে পুকুর বিল আছে?

উপে। বিস্তর।

নলি। পুকুরে পদ্ম শালুক ফোটে?

উপে। কোন কোন পুকুরে ফোটে বৈকি।

নলি। গেলে দেখতে পাওয়া যায়?

উপে। খু—উ—ব।

নলি। তবে আমাকে তোমাদের দেশে নিয়ে যাবে উপীনদা?

উপেন হাসিয়া বলিল, “তুমি যাবে?”

মাথা নাড়িয়া সাগ্রহে নলিনী বলিল, "হুঁ, যাব। আমার ছবি আঁকতে বড্ড সাধ উপীন দা, কিন্তু দেখছি, পাড়াগাঁয়ে না গেলে তো ঠিকমত ছবি আঁকা হবে না।"

উপেন বলিল, "তা তো হবে না, কিন্তু পাড়াগাঁয়ে তুমি যেতে পারবে ?"

নলি। কেন পারবো না ?

উপে। না পারবার প্রধান কারণ, সেখানে যেতে ভাল রাস্তা নাই, গাড়ী ঘোড়া নাই, পায়ে হেঁটে যেতে হবে।

নলি। হাঁটতে আমি খুব পারি। এই যে এক-একদিন আমি মায়ের সঙ্গে গঙ্গা নাইতে যাই।

উপেন হা হা করিয়া হাসিয়া উঠিল। নলিনী সলজ্জভাবে জিজ্ঞাসা করিল, "হাসলে যে ?"

উপেন বলিল, "তোমার হাঁটবার দৃষ্টান্ত শুনে; কল্‌কাতার পাকা রাস্তায় আধ মাইল হেঁটে গঙ্গা নাইতে যাও ব'লে পাড়াগাঁয়ের পাঁচ সাত মাইল মেঠো রাস্তায় হাঁটতে পার কি ?"

জোরে মাথা নাড়িয়া নলিনী বলিল, "খুব পারবো। তুমি নিয়ে যাবে কি না তাই বল।"

উপেন বলিল, "তুমি যদি যাও, আমার সঙ্গে নিয়ে যেতে আপত্তি কি ?"

সহর্ষে নলিনী বলিল, "বেশ, তুমি কদ্দিনে দেশে যাবে ?"

উপে। তিন চার মাস পরে।

নলি। এত দেরী ! কেন, মাসখানেকের মধ্যে যেতে পার না ?

উপে। এই তো সবে পাঁচ সাত দিন চাকরীতে ভর্ত্তি হ'য়েছি, এখন কি ক'রে যাই।

নলি। কেন, আফিসে ছুটী নাও না।

উপে। দু'এক মাস না গেলে ছুটী দেবে কেন ?

হতাশভাবে নলিনী বলিল, "দু'মাস পরে ছুটী নিয়ে যাবে তো ?"

উপেন বলিল, "তা যেতে পারি।"

নলিনী বলিল, "আমাকে সঙ্গে নিয়ে যাবে ?"

"যাব।"

হর্ষ-প্রফুল্ল মুখে নলিনী বলিল, "আমি ছবি আঁকবার সব সরঞ্জাম নিয়ে যাব। পুকুরের ধারে ব'সে ছবি আঁকবো। আচ্ছা, পুকুর ধারে গাছ আছে ?"

"আছে বৈ কি।"

"কি গাছ ?"

"অশ্বথ, বট, তেঁতুল, আম, জাম।"

"ফুল গাছ ?"

"পুকুর ধারে প্রায় ফুলগাছ হয় না, বাগানে হয় ?"

"আচ্ছা, যা আছে তাই আঁকা যাবে। এর মধ্যে আমি কিন্তু আর ছবি আঁকবো না।"

"কেন, আঁকতে দোষ কি ?"

"নাঃ, বড্ড ভুল হয়। এ ছবিখানা আমি ছিঁড়ে ফেলবো।"

খাতাখানা উপেনের সম্মুখ হইতে তুলিয়া লইয়া নলিনী জিজ্ঞাসা করিল, "তুমি এখন কি করবে উপীনদা ? বেড়াতে যাবে কি ?"

মুখ মচ্‌কাইয়া উপেন বলিল, "না, আজ আর যাব না।"

"তবে এস, হার্ম্মোনিয়ম শিখবে।"

হার্ম্মোনিয়ম শিক্ষার প্রতি উপেনের তেমন অনুরাগ না থাকিলেও নলিনী এক প্রকার জোর করিয়াই তাহাকে হার্ম্মোনিয়ম শিখিতে বাধ্য করিয়াছিল। উপেন তাহার ঐকান্তিক অনুরোধ উপেক্ষা করা অসঙ্গত জ্ঞানে, এবং শিখিতে পারি ভালই এইরূপ ভাবিয়া শিক্ষা বিষয়ে একটু

যত্নবান হইয়াছিল। সুতরাং নলিনীর আহ্বানে সে তাহার সঙ্গে গিয়া হার্ম্মোনিয়ম শিখিতে বসিল।

প্রথমে খানিকক্ষণ সা রে গা মা সাধিবার পর দিন দুই আগে নলিনী যে গৎটা শিখাইয়া দিয়াছিল, উপেন সেটা আয়ত্ত করিতে চেষ্টিত হইল। যেখানে যেখানে ভুল হইতে থাকিল, নলিনী সেই সেই স্থান দেখাইয়া দিতে লাগিল। কিন্তু নলিনীর মত বালিকার শিক্ষকোচিত ধৈর্য্য সম্ভব হইতে পারে না। সুতরাং দুই তিনবার দেখাইয়া দিবার পরেও উপেন ভুল করিলে সে উপেনের অক্ষমতা দর্শনে না হাসিয়া থাকিতে পারিল না। তাহার এই উপহাসের হাসিতে লজ্জিত হইয়া উপেন বাজাইতে অনিচ্ছুক হইলে নলিনী অনুনয়-বিনয় করিয়া তাহাকে পুনরায় শিক্ষায় আসক্ত করিয়া দিল।

এইরূপে কিছুক্ষণ গুরু-শিষ্যের মধ্যে অনুরাগ-বিরাগ চলিবার পর উপেন বিরক্তভাবে হার্ম্মোনিয়মটা নলিনীর দিকে ঠেলিয়া দিয়া বলিল, "আর ভাল লাগে না, তুমি একটা গাও।"

নলিনী হার্ম্মোনিয়ম টানিয়া লইয়া তাহার বেলোর উপর দ্রুত-বিলম্বিত চাপ দিয়া আলাপ আরম্ভ করিল। তাহার কোমল অঙ্গুলির মধুর স্পর্শে হার্ম্মোনিয়মের পর্দ্দাগুলা যেন এক নূতন সুরে বাজিয়া উঠিল। সেই সুরে গলা মিশাইয়া নলিনী মৃদু-কোমল-কণ্ঠে গান ধরিল,—

"আমার মনটী করিয়া চুরি, আমার প্রাণটী করিয়া চুরি,
এই আসি ব'লে গিয়াছিলে চলে এতদিনে এলে ফিরে গো।"

সুরের সঙ্গে সঙ্গে নলিনীর কণ্ঠ ক্রমে রেখাব হইতে মধ্যমে, মধ্যম হইতে পঞ্চমে উঠিল; ঝঙ্কারে মূর্চ্ছনায় কক্ষ মধ্যে যেন সুধাবৃষ্টি হইতে লাগিল। নলিনী অমৃতস্রাবী কণ্ঠ পঞ্চমে তুলিয়া, আবেগ-বিহ্বল হইয়া গাহিতে লাগিল,—

"কত নিশি গেছে কতদিন, কত সকাল সন্ধ্যা বেলি,
কত বার মাস কত যুগ যুগান্তর অতীতে পড়িছে ঢলি,
কত মরু গেছে কত সাগরে, কত সাগরে শুখাল বারি,
কত নদী গেছে পথ ভুলি, গলে গেছে কত গিরি গো।"

সুরের উত্থানে-পতনে উপেনের সঙ্গীত-মুগ্ধ হৃদয়ও যেন উঠিতে পড়িতে লাগিল। পশ্চিমগগন-বিলম্বী অস্তমান সূর্য্যের সুবর্ণচ্ছটা বাতায়ন পথে আসিয়া নলিনীর আরক্ত কপোলদেশে উজ্জ্বল রক্তরাগ ঢালিয়া দিতেছিল। উপেন মুগ্ধ নিস্পন্দ হৃদয়ে বসিয়া, সেই সূর্য্য-কিরণোজ্জ্বল রক্তরাগলাঞ্ছিত মুখের দিকে চাহিয়া সঙ্গীতসুধা পান করিতে লাগিল। নলিনী ঊর্দ্ধে দৃষ্টি নিবদ্ধ করিয়া, অঙ্গুলি সঞ্চালনে সুরের মোহিনী ঝঙ্কার তুলিয়া বিভোর প্রাণে গাহিতে লাগিল,—

"সারা জীবনের সাধে রচেছি ডোর,
কোথা যাবে মোর নয়ন চোর ;
ধরেছি যখন বেঁধেছি তখন আর কি ছাড়িতে পারি গো।"

সুর তান-ঝঙ্কৃত কক্ষের প্রতিরন্ধ্র হইতে ঝঙ্কৃত হইতে থাকিল—'আর কি ছাড়িতে পারি গো।' আকাশে বাতাসে প্রতিধ্বনি উঠিতে লাগিল—'আর কি ছাড়িতে পারি গো।' উপেনের বুকের ভিতর কে যেন লুটোপুটি খাইয়া চীৎকার করিতে থাকিল—"আর কি ছাড়িতে পারি গো !

গান থামিল, সুর থামিল, সুরের রেশ্ বাতাসে মিলাইয়া গেল, কিন্তু গানের প্রতিধ্বনি থামিল না ; আকাশ, বাতাস, জলস্থল, ব্যোম প্রতিধ্বনিত করিয়া উপেনের কানের কাছে কে যেন আকুল কণ্ঠে গাহিতে থাকিল—"আর কি ছাড়িতে পারি গো !'

—১৬—

মাসখানেক পরে কাদম্বিনী উপেনের এক পত্র পাইল। উপেন লিখিয়াছে,—

"বড়দি, এখানে এসে অবধি আমি তোমাকে একখানিও চিঠি দিই নাই। এতে তুমি হয় তো আমার উপর খুব রাগ করেছ। কিন্তু সত্যি বড়দি, রোজই মনে করি, তোমাকে চিঠি লিখবো, কিন্তু লেখা হ'য়ে ওঠেনি। কেন হয় নি জান, নলিনীর জন্যে। এদ্দিন নলিনীর ইস্কুলে গরমের ছুটী ছিল, দিনরাত সে বাড়ীতে থাকতো, আর সে দিনরাত আমাকে যেন ব্যস্ত ক'রে রাখতো। কাল থেকে তার ইস্কুল খুলেছে, তাই আজ চিঠি লেখবার ফুরসৎ পেয়েছি।

তুমি মনে কচ্চো, নলিনী আবার কে? সে কে জান, আমি যাঁর আশ্রয়ে আছি, যিনি আমাকে ছেলের মত ভালবাসেন, তাঁরি মেয়ে, বছর পনেরো বয়স। শুধু বয়সের কথা বললে তুমি তাকে ঠিক বুঝতে পারবে না বড়দি, অথচ আমিও যে কি ব'লে নলিনী কেমন মেয়ে তোমাকে বুঝিয়ে দেব তা ভেবে পাই নি। সে খুব লেখাপড়া জানে, ছবি আঁকে, গান গাইতে, হার্ম্মোনিয়ম বাজাতে পারে, আমার মত একজন পরকে ভাই ভাই ক'রে হাসিতে, গল্পে, গানে, রহস্যে, ভালবাসায় জগৎ সংসার সব ভুলিয়ে দিতে পারে। শুধু আমাকে ব'লে নয়, সে যেন বসন্তকালের মিষ্টি বাতাসের মত সারা বাড়ীখানাকে কি এক আমোদে মাতিয়ে রেখেছে। এবার বুঝতে পারলে তো, নলিনী কেমন মেয়ে? এতেও যদি না বুঝতে পার, তবে আর আমি তোমাকে বোঝাতে পারবো না।

যাক্, আমার যে জন্যে এখানে আসা, তাই বলি। আমার চাকরী

হ'য়েছে একটা খুব বড় আফিসে। কাজ কিছুই শক্ত নয়, শুধু কুলীরা জাহাজ থেকে কত মাল নামাচ্চে তারি হিসাব রাখা। এখন পনেরো টাকা ক'রে পাব। বাবু বলেছেন, ছ'তিন মাস পরেই কুড়ি টাকা ক'রে দেবেন। তোমার আশীর্ব্বাদে আমার বেশ চাকরী হ'য়েছে। তা ছাড়া এখানে থাকার বা খাওয়া দাওয়ারও কোন কষ্ট নাই, যেন রাজার হালে আছি। আমার জন্যে তুমি ভেবো না। দাদামশাইকে আমার প্রণাম জানিও। ইতি—উপেন।"

পত্র শুনিয়া কাদম্বিনী এক চোট খুব হাসিয়া লইল। তারপর স্বামীকে সম্বোধন করিয়া বলিল, "হাঁ গা, উপ্‌নে ওই মেয়েটাকে বিয়ে করবে নাকি?"

নীলমণি বলিল, "নিশ্চয়ই করবে। দেখ না কোন্ দিন সে বৌ নিয়ে হাজির হয়। তোমরা বৌভাতের যোগাড় ক'রে রাখ।"

কাদম্বিনী বলিল, "বৌভাতের যোগাড় আমি কত্তে যাব কেন? সে যোগাড় করবে তার দিদি।"

নীলমণি হাসিয়া বলিল, "তুমি তো তার বড়দিদি।"

ভারী মুখে কাদম্বিনী বলিল, "আমি হচ্চি নকল দিদি, আসল দিদি হচ্চে ছোটবৌ।"

নীলমণি বলিল, "উপেন কিন্তু আসল ছেড়ে নকলের খোঁজই তো আগে নিয়েছে।"

হাস্য-প্রফুল্ল মুখে কাদম্বিনী বলিল, "তা নেয় বটে উপ্‌নে। তার পেটের কথা যা কিছু সব আমার কাছে। এইজন্যে সে ছোট বোয়ের কাছে কতবার কত গাল বকুনি খেয়েছে। হতভাগার তবু লজ্জা নাই, বড়দি, বড়দি। তাই তো ছোটবৌ বলতো, আমি তাকে যাদু করেছি।"

ঈষৎ হাসিয়া নীলু বলিল, "তা ছোট বৌমা তো মিথ্যা বলে নি, ওটা যে তোমার পেশা।"

বিস্ময়ের সহিত কাদম্বিনী জিজ্ঞাসা করিল, "কোন্‌টা আমার পেশা গো?"

নীলু উত্তর করিল, "ঐ যাদু করা।"

বিস্ময়চমকিত ভাবে গালে হাত দিয়া কাদম্বিনী বলিল, "ক'ও কথা মা, কা'কে আমি যাদু করলাম গো?"

নীল। এই আমাকে।

কাদ। তোমাকে আমি যাদু করেছি?

নীল। আমি তো তাই মনে করি, বড়বৌ।

কাদ। ধন্যি তোমার মনে করা। মা গো মা, লোকে শুনলে কি বলবে।

হাসিতে হাসিতে নীলু বলিল, "লোকে না শুনেই তো বলছে, আমাকে তুমি যাদু ক'রে ভেড়া বানিয়ে রেখেছ। শুন্‌লে এর বেশী কি বলবে, তা তো জানি না।

কাদম্বিনী এবার হাসিয়া উঠিল; বলিল, "আচ্ছা, আচ্ছা, তোমার আর তা জানতে হবে না। তুমি এমনি সোজা পুরুষটী বটে, তোমাকে আমি ভেড়া বানিয়ে রাখবো। তুমিই আমাকে পোষা পাখীটা বানিয়ে রেখেছ কিনা তাই ভেবে দেখ।"

মস্তক সঞ্চালন পূর্ব্বক গম্ভীর হাস্য সহকারে নীলমণি বলিল, "তুমি পোষা পাখী বটে, কিন্তু শিক্‌লী-কাটা পাখী; পায়ের শিকল কাটতে পারলে আর পোষা নও।"

স্বামীর মুখের কাছে হাতখানা নাড়িয়া সহাস্য তর্জ্জনের সহিত কাদম্বিনী বলিল, "তা বলবে বৈ কি, তবু নিজে যদি মাঝে মাঝে শিক্‌লী কাটবার চেষ্টা না কত্তে।"

নীলমণির মুখের উপর কৃত্রিম কোপপূর্ণ কটাক্ষ নিক্ষেপ করিয়া কাদম্বিনী মুখ টিপিয়া হাসিতে হাসিতে প্রস্থান করিল।

অতঃপর কাদম্বিনী কুসুমের নিকট গিয়া উপেনের পত্রের কথা ব্যক্ত করিলে কুসুম অপ্রসন্নমুখেই উত্তর করিল, "বেশ হয়েছে। তবে—'বাপ রাজা তো রাজার ঝি, ভাই রাজা তো বোনের কি ?"

তাহার এই উত্তরে বিরক্ত হইয়া তিরস্কার করিয়া কাদম্বিনী বলিল, "আ মরণ, বোনের আবার কি লো ? ভায়ের সুখেই বোনের সুখ। সে এখানে থেকে হেনস্তায় দিন কাটাতো ; এখন দশ টাকা রোজগার ক'রে যদি সুখী হয়, সেটা ভাল নয় কি ?"

মুখ বাঁকাইয়া কুসুম বলিল, "ভাল নয় তো আমি কি বলছি মন্দ ? তবে আমার ঘরে থেকে তাকে হেনস্তা ভোগ কত্তেও আমি তাকে বলি নাই, সে নিজেই এসেছিল।"

ভ্রূভঙ্গী সহকারে কাদম্বিনী বলিল, "মুখে আগুন। তুই তাকে হেনস্তা করেছিস্ এমন কথা কি আমি বলছি ? পাঁচজনের কাছে তো সে হীন হ'য়ে ছিল। হাজার সুখে থাক্‌লেও লোকে বল্‌তো, বোনায়ের ভাতে রয়েছে।"

ভারী মুখে কুসুম উত্তর করিল, "বোনায়ের ভাতে ছিল, তাই লোকে ও কথা বল্‌তো। সে ছিল কেন ? তার যেমন পোড়া কপাল !"

রাগতভাবে কাদম্বিনী বলিল, "তুই বড় উল্‌টা বুঝিস্ ছোটবৌ, তোকে চিঠি শোনাতে আসাই আমার ঝক্‌মারি হয়েছে।"

তীব্র কণ্ঠে কুসুম বলিল, "শোনাতে এলে কেন দিদি ? আমি তো শুনতে চাই নাই। শোনবারই আমার দরকার কি ?"

যেন খুব আশ্চর্য্যান্বিতভাবে কাদম্বিনী বলিল, "তোর শোনবার দরকার নাই ?"

কুসুম বলিল, "দরকার থাকলে সে নিজেই আমাকে শোনাতো। তা তো নয়, যারা তার দরদের লোক, তাদেরি সে শুনিয়েছে।"

ভ্রূকুটি করিয়া কাদম্বিনী বলিল, "তুই তার মা'র পেটের বোন,— তোর চেয়ে কি আমি দেশী দরদের লোক?"

মুখভঙ্গী করিয়া কুসুম বলিল, "তা নইলে তোমাকেই বা চিঠি লিখতে যাবে কেন?"

তীব্র দৃষ্টিতে তাহার মুখের দিকে চাহিয়া চাহিয়া ক্ষুব্ধকণ্ঠে কাদম্বিনী বলিল, "ধন্যি তোর কথা ছোটবৌ! তোর চেয়ে আমি হলাম উপ্‌নের বেশী দরদী? সে আমার কে?"

রোষগম্ভীরভাবে কুসুম বলিল, "কে, তা তুমিই বল্‌তে পার। কথা বাড়াও কেন দিদি, জান্‌তে আমার কিছু বাকী নাই। উপ্‌নে এখানে ছিল, তাতে কত লোক কত কথাই কয়েচে,—তাকে চাকরের মত খাটিয়ে মেরেছি, মুখ চেয়ে খেতে দিই নাই, ভাগ্যে তার সব দরদীরা ছিল, তাই কোন রকমে দিন কাটিয়েছে। কিন্তু একটা কথা ব'লে রাখি দিদি, মা'র চেয়ে যে দরদী, তারে বলি ডা'ন।"

বলিয়া কুসুম মুখখানা যেন ঘৃণার সহিত ঘুরাইয়া লইল। কাদম্বিনী দেখিল, কথার উত্তর দিতে গেলে ঝগড়ার সম্ভাবনা। কাজেই সে আর কিছু না বলিয়া ক্ষুব্ধচিত্তে প্রস্থান করিল।

বাড়ী ফিরিয়া কাদম্বিনী স্বামীকে বলিল, "উপেনকে লিখে দাও তো, সে যেন আমাকে আর চিঠিপত্র না লেখে!"

ঈষৎ হাসিয়া নীলমণি জিজ্ঞাসা করিল, "সে বেচারীর উপর এত রাগ কেন?"

ঝঙ্কারের সহিত কাদম্বিনী বলিল, "রাগ আবার কোন্‌খানটায় দেখলে?"

নীলমণি বলিল, "ঐ চিঠি লিখতে বারণ করাটায়।"

ঘাড়-মুখ নাড়িয়া কাদম্বিনী বলিল, "সে কেন আমাকে চিঠি লিখতে যাবে বল তো? আমি তার কে? তার বোন রয়েছে, বোনাই রয়েছে, চিঠি লিখতে হয়, তাদের লিখবে!"

নীলমণি বলিল, "আচ্ছা, তাই লিখতে ব'লে দেব।"

ক্রোধ-গম্ভীর মুখে কাদম্বিনী বলিল, "তোমাকে এত কথা লিখতে কে বলছে?"

নীলমণি বলিল, "তবে কি শুধু লিখে দেব, তোমার বড়দি চোরের উপর রাগ ক'রে মাটীতে ভাত খাচ্চে?"

"যাও, তোমাকে কিছু লিখতে হবে না," বলিয়া কাদম্বিনী সবেগে মুখটা ঘুরাইয়া লইল। নীলমণি হা হা করিয়া হাসিয়া উঠিল।

—১৭—

দয়ারাম বাড়ীতে আসিলে কুসুম তাহাকে সম্বোধন করিয়া বলিল, "শুনেছ গা, উপ্‌নের চাকরী হ'য়েছে, আর তোমার ভাবনা নাই।"

গম্ভীরভাবে দয়ারাম উত্তর করিল, "আমার ভাবনা থাক্ না থাক্, তোমার ভাবনা ঘুচেছে তো?"

মুখ মচ্‌কাইয়া কুসুম বলিল, "হাঁ, আমার ভাবনা ঘুচেছে বৈ কি। আমার কি কম ভাবনা ছিল? উপ্‌নের ভাবনায় আমার খেয়ে পেট ভরতো না, শুয়ে ঘুম হ'তো না।"

একটু উপহাসের হাসি হাসিয়া দয়ারাম বলিল, "যাক্, এখন ঘুমিয়ে বাঁচবে। আমিও বিয়ে দু'টো সেরে দিতে পারলে নিশ্চিন্ত হ'য়ে ঘুমুতে পাই।"

কুসুম জিজ্ঞাসা করিল, "দু'টো বিয়ে আবার কার গো?

একটা তো গিরির বিয়ে; আর একটা—নিজে আবার বিয়ে করবে না কি?"

দয়া। মনে তো তাই কচ্চি।

কুসু। মনে যা কচ্চো, কাজে সেইটা করে ফেল না।

দয়া। এদ্দিন ক'রে ফেলতুম, শুধু একটা বাধা—

কুসু। বাধাটা কি? আমি না কি?

গম্ভীরভাবে মাথাটা নাড়িয়া দয়ারাম উত্তর করিল, "তুমিও একটা কম বাধা নও।"

কুসুম বলিল, "আচ্ছা, তুমি বিয়ে কর, আমি তোমাকে বাধা দেব না।"

দয়ারাম বলিল, "বাধা দিলেও সে বাধাটাকে খুব সহজেই উড়িয়ে দিতে পারি, কিন্তু বয়সের বাধাটাকে তো তত সহজে উড়াতে পারবো না।"

সপ্রতিভভাবে কুসুম বলিল, "ওঃ, তা হ'লে বয়স হয়েছে ব'লেই বিয়ে কত্তে পাচ্চো না? তা এমনই কি বয়স হয়েছে তোমার? বড় জোর চল্লিশ।"

দয়া। চল্লিশ অনেক দিন চ'লে গিয়েছে, পঞ্চাশের কাছাকাছি এসে পড়েছি।

কুসু। তা পুরুষমানুষের পঞ্চাশ বছর বয়স, কি এমন বেশী বয়স?

দয়া। তোমার বিবেচনায় বেশী নয়, কিন্তু মেয়ের মা তো তোমার মত বিবেচক নয়?

কুসু। মেয়ের মা কে? মেনীর মা বুঝি?

দয়া। হাঁ, চুয়াল্লিশ বছরের পাত্রের সঙ্গে মেয়ের বিয়ে দিতে হবে, তাতেই কত কাঁদাকাটা কচ্চে।

কুসু। তা করবে বৈ কি। তবু যদি মেয়ে একটু সুশ্রী হ'তো।

দয়া। মায়ের চোখে সুশ্রী কুশ্রী প্রভেদ নাই ছোটবৌ। মায়ের কাছে কাণা ছেলেও পদ্মলোচন হয়।

গম্ভীর মুখে কুসুম বলিল, "মায়ের কাছে পদ্মলোচন হয় ব'লে অপরের কাছে তো তা হবে না।"

দয়ারাম বলিল, "তা হয় না ব'লেই তো মেয়েটার পাত্র জুটচে না। কত কষ্টে এই পাত্রটি যোগাড় করেছি। তাও নগদ আড়াই শো চাই।"

কুসুম বলিল, "মোটে আড়াই শো! এ আর এমন বেশী কি হ'লো? আমাদের গিরির তরে যে ছেলে দেখেছ, তাকে তো সাত শো দিতে হবে।"

ঈষৎ হাসিয়া দয়ারাম বলিল, "তা হবে! কিন্তু সে হচ্চে ছেলে, আর এ হচ্চে বুড়ো।"

গম্ভীর মুখখানা ঘুরাইয়া লইয়া কুসুম বলিল, "হাঁ, বুড়ো! চুয়াল্লিশ বছরে মানুষ বুঝি বুড়ো হয়? তা হ'লে তুমিও বুড়ো হয়েছ বল।"

দয়ারাম বলিল, "সম্পূর্ণ বুড়ো না হ'লেও ছোকরা নই, বিয়ের বয়সও নাই।"

ঝঙ্কারের সহিত কুসুম বলিল, "তোমাকে বলেছে বয়স নাই। আমার মামা যে ষাট বছর বয়সে বিয়ে করেছিল।"

সহাস্যে দয়ারাম বলিল, "তিনি বিয়ের জন্যে বিয়ে করেন নি, অনেক জাল-জুয়াচুরির পয়সাগুলো পাছে পাঁচভূতে খায়, তাই সেগুলো একটা বিধবার হাতে গচ্ছিত ক'রে দেবার জন্যে এই কাজ করেছিলেন।"

কুসু। যে জন্যেই হোক, বিয়ে তো করেছিলেন। আর এমন তো অনেকেই ক'রে থাকে।

দয়া। তা করে বৈ কি। কিন্তু তাই ব'লে বুড়ো বরের হাতে কেউ কি সহজে মেয়ে দিতে চায়?

কুসু। দায়ে পড়লে দিতে হয় বৈ কি।

দয়া। দায়ে প'ড়ে দিতে হয় বটে, কিন্তু তাতে কি মনে সুখ-শান্তি হ'তে পারে?

ঘাড় নাড়িয়া কুসুম বলিল, "তাও কি হয়? তবে মেয়ের যেমন কপাল।"

দয়ারাম বলিল, "এখন মেয়ের কপালই বল্‌তে হবে। নইলে উপ্‌নে ছোঁড়াটা—যাক্‌, উপেনের চাকরী হয়েছে, কে তোমাকে বল্‌লে?"

কুসু। ও বাড়ীর বড়দি।

দয়া। মাইনে কত হয়েছে?

কুসু। এত কথা আমি জিজ্ঞাসা করি নাই।

দয়া। জিজ্ঞাসা করাটা দরকার ছিল।

কুসু। দরকারটা কি শুনি? সে কি মাইনের টাকা তোমাকে দেবে?

হাসিতে হাসিতে দয়ারাম বলিল, "এই শোন পাগলের কথা। সে তার মাইনের টাকা আমাকে দিতে যাবে কেন?"

কুসুম জিজ্ঞাসা করিল, "তবে সে কথা জান্‌তেই বা যাব কেন?"

গাম্ভীর্য্যসূচক মস্তকসঞ্চালন সহকারে দয়ারাম বলিল, "জান্‌তে হয় বৈ কি। যতই হোক, আপনার লোক,—বিদেশে গিয়েছে, চাকরী কচ্চে; কিন্তু কি চাকরী, কত মাইনে, তা জানবে না?"

বিরক্তি-কুঞ্চিতমুখে কুসুম বলিল, "জান্‌তে হয়, নিজে জেনে এস। আমার এত কথা জান্‌বার জন্যে মাথাব্যথা হয়নি।"

দয়ারাম বলিল, "তোমার ভাই,—মাথাব্যথা হ'লে তোমারি হবে। যাক্, আমি নিজেই জেনে আসছি।"

উপেনের বেতনের পরিমাণ জানিবার জন্য দয়ারাম নিজেই নীলু ঘোষের বাড়ীতে গেল, এবং খানিক পরে ফিরিয়া আসিয়া কুসুমকে সম্বোধন করিয়া বলিল, "শুনচো ছোটবৌ, নেহাৎ মন্দ নয়, পনেরো টাকা মাইনে হয়েছে, শীগ্‌গীর কুড়ি টাকা হবে।"

শ্লেষ-পূর্ণ-স্বরে কুসুম বলিল, "সেই জন্যেই তো বলছিলাম, তোমার আর ভাবনা নাই।"

দয়ারাম বলিল, "আমার ভাবনা থাক্ বা না থাক্, তার বিয়েটা মোদ্দা শীগ্‌গীর দিতে হবে। তা নইলে সে ক'লকাতাতেই বিয়ে ক'রে ফেল্‌বে।"

কুসুম জিজ্ঞাসা করিল, "কে বল্‌লে?"

দয়ারাম বলিল, "বলবে আবার কে? তার চিঠির ভাবেই সেটা বোঝা গিয়েছে। এই শোন না তার চিঠি।"

দয়ারাম ট্যাঁক হইতে চিঠিখানা বাহির করিয়া আদ্যোপান্ত পাঠ করিল। তার পর স্ত্রীর মুখের দিকে চাহিয়া জিজ্ঞাসা করিল, "এবার বুঝতে পেরেছ কি?"

কুসুম উত্তর করিল, "বুঝেছি, ঐ নলিনী ব'লে যে মেয়েটা—"

দয়ারাম বলিল, "হাঁ হাঁ, ঐ মেয়েটাকে ঘাড়ে চাপাবার জন্যে তাকে এত আদর ক'রে বাড়ীতে রেখেছে। নইলে ধর না, উপেন তাদের কে, কোন্ জন্মে তাদের সঙ্গে পরিচয় ছিল যে, তাকে এমন ছেলের মত যত্ন ক'রে রাখবে।"

সন্দিগ্ধস্বরে কুসুম বলিল, "তাও কি সম্ভব? উপ্‌নে এমন কি সুপাত্র যে, তাকে মেয়ে দেবার জন্যে তারা এতটা করবে?"

মাথা নাড়িয়া দয়ারাম বলিল, "ওগো, সুপাত্র কুপাত্র ছেড়ে দাও। ক'লকাতা সহরের মেয়ের বিয়ের ব্যাপার তো জান না। এখানকার মত সেখানে পাঁচ সাত শো টাকায় মেয়ের বিয়ে হয় না, পাঁচ সাত হাজার চাই। আর উপেন এমনি কি কুপাত্র। কুড়ি টাকা মাইনের চাকরী কচ্চে, দেখতে শুন্‌তে মন্দ নয়, অথচ দিতে কিছুই হবে না। এমন সুযোগ কি ছেড়ে দেয়? তুমি দেখে নিও, উপেন যদি আর দু'চার মাস সেখানে থাকে, নিশ্চয় ঐ মেয়েটাকে বিয়ে ক'রে বসবে।"

কুসুম বলিল, "যদিই বিয়ে করে, তাতে দোষ কি?"

স্ত্রীর এই অজ্ঞতায় বিরক্তি প্রকাশ করিয়া দয়ারাম বলিল, "দোষ কি, মেয়েমানুষ তুমি—কি বুঝবে বল, ইস্কুলে যায়, হারমোনিয়ম বাজায়, গান গায়, ঐ মেয়েকে কোন্ ভদ্রলোকের ছেলে বিয়ে করে? তারপর কি জাত, তার ঠিকানা নাই।"

কুসুম বলিল, "কও কথা, জাত আবার কি হাড়ীমুচি হবে? কায়েত না হ'লে কি কায়েতের ছেলেকে মেয়ে দেয়?"

ঘাড় দোলাইয়া দয়ারাম বলিল, "ক'লকাতা সহরের কাণ্ডকারখানা তুমি তো কিছুই জান না; ক'লকাতায় সবাই কায়েত। এখানে যেমন জাত হারালেই বোষ্টম, ক'লকাতায় তেমনি জাত হারালেই কায়েত। কত ধোবা, কলু কায়েত সেজে ভদ্রলোকের ঘর মজিয়েছে।"

শঙ্কিতভাবে কুসুম জিজ্ঞাসা করিল, "তা হ'লে উপায়?"

দয়ারাম বলিল, "উপায় আছে, কোন রকমে উপেনকে একবার এখানে আনিয়ে তার বিয়ে দিয়ে ফেলা।"

উদ্বিগ্নভাবে কুসুম বলিল, "তবে বিয়েই দিয়ে দাও। কিন্তু—"

দয়ারাম জিজ্ঞাসা করিল, "কিন্তু ব'লে থেমে গেলে যে?"

কুসুম বলিল, "থামবো কেন? তবে এত শীগ্‌গীর মেয়ে পাওয়া—"

দয়া। মেয়ের ভাবনা কি ? বল তো কালই মেয়ের যোগাড় ক'রে দিতে পারি।

কুসু। মেয়ে ঐ মেনী তো ?

ঈষৎ ক্রুদ্ধভাবে দয়ারাম বলিল, "কেন, মেনী ছাড়া কি মেয়ে আর নাই ?"

কুসুম চুপ করিয়া রহিল। দয়ারাম বলিল, "মেয়ে ঢের আছে, তবে এটা হ'লে থোক্‌থাক্ কিছু পাওয়া যেতো।"

কুসু। আর সেই থোক্‌থাক্ দিয়ে তোমার মেয়ের বিয়েটা হ'য়ে যেতো !

দয়া। কেন, তোমার ভায়ের বিয়ের টাকা না হ'লে আমার মেয়ের বিয়ে হবে না বুঝি ?

ঈষৎ অপ্রতিভভাবে কুসুম বলিল, "বিয়ে হবে না, এমন কথা কি আমি বলছি। যাক্, তা হ'লে একটা মেয়ে চেষ্টা দেখ।"

দয়ারাম বলিল, "তা দেখছি, আর তাকে বাড়ী আসবার জন্যে কালই একখানা চিঠি লিখে দেব।"

দয়ারাম তামাক সাজিয়া লইয়া বাহিরে আসিল, এবং ধীরে ধীরে তামাক টানিতে টানিতে কোথায় মেয়ে দেখিবে, তাহাই ভাবিতে লাগিল।



"মা, কি ভাবচো মা ?"

নিস্তারিণী একা বসিয়া আকাশ পাতাল ভাবিতেছিলেন। ভগবান কবে কি করিয়া তাঁহাকে এই বিষম কন্যাদায় হইতে উদ্ধার করিবেন ? দয়ারাম তো সকলই এক প্রকার স্থির করিয়াছে, কিন্তু যতক্ষণ না দুই হাত এক হয়, ততক্ষণ বিশ্বাস নাই। যে ভাঙ্গা কপাল তাঁহার।

বিবাহের কথাবার্ত্তা স্থির হইয়াছে বটে, কিন্তু সে বিবাহের কথা মনে করিলেও চোখে জল আসে। এই বারো তেরো বছরের মেয়ে, তাহাকে কি না পঞ্চাশ বছরের বুড়ার হাতে ধরিয়া দিতে হইবে। পঞ্চাশ বৈ কি; দয়ারাম নিজে যখন বলিতেছে চুয়াল্লিশ, তখন পঞ্চাশের কম তো কিছুতেই নয়, তাহারও বেশী না হয়। কিন্তু নিরুপায়,—জানিয়া শুনিয়া হাত-পা বাঁধিয়া মেয়েটাকে জলে ফেলিয়া দিতে হইবে। পয়সা থাক্ না থাক্, মেয়েটা যদি একটু সুশ্রী হইত? সুশ্রী হউক না হউক, এত দিন তিনি যদি বাঁচিয়া থাকিতেন? এখনও বেশ মনে পড়ে, মেয়েটার বয়স তখন আড়াই বছর; একদিন তিনি এই মেয়েকে বুকে লইয়া মা মা বলিয়া আদর করিতেছিলেন; তদ্দর্শনে নিস্তারিণী পরিহাস করিয়া বলিয়াছিলেন, "হাঁ, কালো-কুচ্ছিত মেয়ে, তার আবার এত আদর! ও মেয়েকে পার করবে কি ক'রে, তাই এখন থেকে ভাব।" ইহা শুনিয়া তিনি হাসিতে হাসিতে উত্তর করিয়াছিলেন, "কিছুই ভাবনা নাই তোমার, দেখবে, এই কালো মেয়ের চাঁদের মত বর এনে দেব।" হায়, আজ তিনি কোথায়? চাঁদের মত বরের পরিবর্ত্তে নিস্তারিণী যে আজ তাঁহার আদরের মেয়েকে বুড়া বরের হাতে তুলিয়া দিতেছে! হায়, তিনি বাঁচিয়া থাকিলে কি এমন হইত? অতীতের স্মৃতির তাড়নায় নিস্তারিণীর চোখ দুইটা জলে ভরিয়া আসিল; বুকের হাড়গুলাকে যেন ভাঙ্গিয়া দিয়া একটা গভীর দীর্ঘ-নিশ্বাস বাহির হইল।

মেনী বেড়াইতে গিয়াছিল। সে বাড়ী ফিরিয়া মায়ের কাছে আসিয়া দাঁড়াইল, এবং মাতার চিন্তা-কাতর মুখের দিকে চাহিয়া করুণ কণ্ঠে জিজ্ঞাসা করিল, "মা, কি ভাবচো মা?"

নিস্তারিণী উদ্গত অশ্রুপ্রবাহ সাম্‌লাইয়া লইয়া, কন্যার মুখের উপর

সজল দৃষ্টি স্থাপন করিয়া উত্তর করিলেন, "তুই কোথায় গিয়েছিলি মেনি ?"

মেনী বলিল, "গৌরীদের বাড়ীতে বেড়াতে গিয়েছিলুম। দেখ মা, গৌরীকে আজ দেখ্তে আসবে। তাই গৌরীর মামী গৌরীকে এমন সাজাচ্চে !"

মুখ ফিরাইয়া লইয়া নিস্তারিণী বলিলেন, "তা সাজাক্। তুই এতক্ষণ সেখানে কি কচ্ছিলি ?"

মেনী বলিল, "গৌরীর সাজগোজ দেখ্ছিলুন। দেখ মা, খুব বড় লোকের বাড়ীতে গৌরীর বিয়ে হবে। শান্ত দিদি বল্লে, খুব ধূমধাম ক'রে বর আসবে, সোনাদানায় গৌরীকে না কি মুড়ে দেবে।"

ঈষৎ ক্রুদ্ধভাবে নিস্তারিণী বলিলেন, "তবে আর কি, আমাদের সব দুখ্যু ঘুচে যাবে। এই সব দেখতে, এই সব গল্প শুন্তেই তুই বুঝি পাড়া-বেড়াতে যাস্ ?"

মায়ের রাগ দেখিয়া সঙ্কুচিতভাবে মেনী উত্তর করিল, "তা এ সকল শুন্তেও কি দোষ আছে মা ?"

সতর্জ্জনে নিস্তারিণী বলিলেন, "খুব দোষ আছে। আমরা গরীব, আমাদের এ সব বড় লোকের কথায় থাক্তে নাই।"

মেনী অপরাধীর মত ম্লানমুখে নীরবে দাঁড়াইয়া রহিল। নিস্তারিণী তাহার ভীতিমলিন মুখের উপর সরোষ কটাক্ষ নিক্ষেপ করিয়া গম্ভীর কণ্ঠে বলিলেন, "আমি তোকে কি বলেছিলাম ?"

শঙ্কিতস্বরে মেনী উত্তর করিল, "কি বলেছিলে মা ?

নিতা। আমি না তোকে পাড়া-বেড়াতে বারণ করেছিলাম ?"

মেনী। আমিও তো তাই আর কোথাও বেড়াতে যাই না।

নিস্তা। তবে আজ গিয়েছিলি কেন ?

মেনী। আজ নাইতে গিয়ে শুনলুম, গৌরীকে দেখ্‌তে আস্‌বে। তাই একবার শান্ত দিদির সঙ্গে ওদের ওখানে গিয়েছিলুম।

নিস্তা। আমাকে ব'লে গেলি না কেন ?

মেনী। বল্‌লে হয় তো তুমি যেতে দিতে না।

নিস্তা। হয় তো কেন, কক্ষনো যেতে দিতাম না।

মেনী শঙ্কাকাতর দৃষ্টিতে একবার মাতার রোষকঠিন মুখের দিকে চাহিয়াই দৃষ্টি নত করিল। নিস্তারিণী বলিলেন, "কেন আমি যেতে বারণ করি, তা জানিস্ ?"

"না।"

"গরীব লোক বড়মানুষের বাড়ীতে গেলে তারা বিরক্ত হয়, ঘৃণায় গরীবের সঙ্গে মুখ তুলে কথা কয় না।"

ছাঁৎ করিয়া একটা কথা মেনীর মনে পড়িল। সে শান্তদিদির সঙ্গে কয়েকবার গৌরীদের বাড়ীতে বেড়াইতে গিয়া দেখিয়াছে বটে, গৌরীর মামী শান্তদিদিকে কেমন যত্ন করিয়া বসায়, হাসিয়া হাসিয়া তাহার সঙ্গে কথা কয়, কিন্তু মেনীকে বসিতেও বলে না, তাহার দিকে মুখ ফিরাইয়া একবারও তাকায় না। তাহা হইলে মায়ের কথা তো সত্য, বড়লোকেরা সত্যই তো গরীবকে ঘৃণা করে; মাতার নিষেধ উপেক্ষা করিয়া মেনী তো সত্যই এই ঘৃণা কুড়াইতে গিয়াছে। ছি ছি, সে করিয়াছে কি ? আপনার অপমান জন্য বেদনার গুরুত্ব অনুভব করিয়া মেনী একটু কাতর হইয়া পড়িল; সে মায়ের পায়ের কাছে বসিয়া পড়িয়া অশ্রুকাতর কণ্ঠে বলিল, "আমি না জেনে গিয়েছি মা, আর কখনো যাব না।"

নিস্তারিণী কিয়ৎক্ষণ স্থিরদৃষ্টিতে কন্যার বেদনা-মলিন মুখের দিকে

চাহিয়া রহিলেন; তার পর ধীরে ধীরে তাহার মাথাটা আপনার কোলের উপর টানিয়া লইয়া তাহার গায়ে মাথায় হাত বুলাইতে লাগিলেন।

মায়ের কোলে মাথা রাখিয়া মেনী ছলছল চোখে জিজ্ঞাসা করিল, "তুমি কি ভাবছিলে মা?"

মৃদু হাসিয়া নিস্তারিণী বলিলেন, "কে তোকে বল্‌লে, আমি ভাবছিলাম?"

মেনী বলিল, "কে আবার বলবে। আমি তোমার মুখ দেখেই বুঝেছি, তুমি খুব ভাবছিলে।"

মেয়ের অনুমানশক্তি দেখিয়া মা ঈষৎ হাসিলেন; বলিলেন, "বল্‌ দেখি, কি ভাবছিলাম?"

ঘাড়টা একটু কাত করিয়া সহাস্যমুখে মেনী বলিল, "তা আমি কি ক'রে বলবো?"

মেয়ের মুখের দিকে চাহিয়া মা একটু হাসিলেন। মেনী বলিল, "সত্যি মা, কি ভাবছিলে বল না।"

নিস্তারিণী বলিলেন, "ভাবছিলাম, আমি মরবো কবে!"

ঠোঁট ফুলাইয়া ভারী মুখে মেনী বলিল, "হাঁ, সে কথা বুঝি আবার কেউ ভাবে?"

নিস্তা। কেউ না ভাবলেও আমি ভাবি।

মেনী। কেন ভাব?

নিস্তা। ম'লে আর কোন জ্বালাযন্ত্রণা থাক্‌বে না ব'লে।

মায়ের কোল হইতে সবেগে মাথাটা তুলিয়া লইয়া অভিমান-গম্ভীর কণ্ঠে মেনী জিজ্ঞাসা করিল, "তোমার কি এত জ্বালা-যন্ত্রণা শুনি!"

‘ডহুড়’



নিস্তা। জ্বালা-যন্ত্রণার কমটাই বা কি আছে মেনী ?

মেনী। হুঁ, ভারী তোমার জ্বালা-যন্ত্রণা।

বলিয়া মেনী মায়ের মুখের উপর রোষগম্ভীর দৃষ্টি নিক্ষেপ করিল। মেয়ের রাগ দেখিয়া মা একটু হাসিলেন, বলিলেন, "আচ্ছা মেনী, আমি মরবো বল্‌লে তুই এত রাগ করিস্ কেন ?"

জোরে ঘাড়টা দোলাইয়া ভারী গলায় মেনী বলিল, "সাধে রাগ করি! কেন তুমি এমন সব কথা বলবে ?"

সহাস্যমুখে নিস্তারিণী বলিলেন, "বল্‌লেই বা। মুখে বল্‌লেই কি সত্যি সত্যিই ম'রে যাব ?"

মেনী বলিল, "যাও আর নাই যাও, এমন সব কথা তুমি বলতে পারে না।"

হাসিতে হাসিতে নিস্তারিণী বলিলেন, "আচ্ছা, তা না হয় বলবো না। কিন্তু মরণ যখন আসবে, তখন তুই কি আমাকে ধ'রে রাখতে পারবি ?"

মেনী বলিল, "সে তখন দেখা যাবে। কিন্তু এখন থেকে দিনরাত মরবো মরবো, এ সব কথা ভাল লাগে না।"

নিস্তারিণী বলিলেন, "তোর ভাল লাগবে না, তা জানি, কিন্তু অনেক দুঃখেই মুখ দিয়ে এ সব কথা বেরিয়ে যায়। নইলে মত্তে কি কারো সাধ ?"

মেনী বলিল, "আর কারো সাধ না হ'লেও তোমার খুব সাধ।"

ম্লান হাসি হাসিয়া নিস্তারিণী বলিলেন, "একটুও সাধ নাই মেনী। সত্যি বল্‌তে কি, এই তো মরবো মরবো বলছি, কিন্তু আজ যদি মরণ এসে সাম্‌নে দাঁড়ায়, তা হ'লে আমি তাকে মিনতি ক'রে বলবো, হে মরণ, এখন তুমি স'রে যাও, আমার মেনীর একটা গতি না ক'রে আমি

মত্তে পারবো না। এত দুঃখ-কষ্টের মধ্যেও তুই যে আমার একটু সুখের ক্ষীণ আলো মেনী।”

নিস্তারিণীর বিষাদগম্ভীর মুখমণ্ডল অপত্যস্নেহে সমুজ্জ্বল হইয়া উঠিল। মেনী মাতার স্নেহ-প্রদীপ্ত মুখের দিকে চাহিয়া চাহিয়া ধীরে ধীরে জিজ্ঞাসা করিল, “আচ্ছা মা, আমিই কি তোমার যত দুঃখের—যত ভাবনার মূল নয় ?”

ক্ষীণ দীর্ঘনিশ্বাস ত্যাগ করিয়া নিস্তারিণী বলিলেন, “তুই যেমন দুঃখের মূল, তেমনি সুখেরও মূল মেনী। এই যে এত দুঃখ-কষ্ট স’য়েও বেঁচে আছি, সেটা শুধু তোরই মুখ চেয়ে। তাই ভাবি, বিয়ে দিয়ে তোকে পরের ঘরে পাঠিয়ে কি নিয়ে সংসারে থাকবো ?”

মেনী নতমুখে কিয়ৎক্ষণ নীরবে থাকিয়া মৃদু কণ্ঠে বলিল, “আচ্ছা মা, তাই যদি ভাব, তবে বিয়ে দিচ্চো কেন ?”

নিস্তারিণী একটু বিস্ময় প্রকাশ করিয়া বলিলেন, “ও মা, বিয়ে দেব না ? চিরকাল আইবুড়ো থাকবি ?”

ঘাড় দোলাইয়া মেনী বলিল, “থাক্‌লেই বা; তা হ’লে তো তোমাকে ছেড়ে আর কোথাও যেতে হবে না। আর আমার বিয়ের তরে তোমাকে এত ভাবতেও হবে না।”

মেয়ের পাগলের মত কথায় নিস্তারিণীর হাসি আসিল। হাসিতে হাসিতে বলিলেন, “পাগল মেয়ে! চিরকাল আমাকে আগলে থাকবি ? সংসারধর্ম্ম করবি না ?”

মেনী বলিল, “পরের ঘরে না গেলে বুঝি সংসারধর্ম্ম হয় না ?”

নিস্তা। কি ক’রে তা হবে মেনী ?

মেনী। কেন, ঐ যে পদ্ম পিসী বিধবা হয়ে মায়ের কাছে রয়েছে, তার কি সংসার-ধর্ম্ম হচ্ছে না ?

ব্যস্ততা সহকারে বাধা দিয়া নিস্তারিণী বলিলেন, "বালাই, ষাট্! ও কি অলক্ষুণে কথা মেনী? ও রকম অদৃষ্ট যেন অতি বড় শত্রুরও না হয়। ভগবানের কাছে প্রার্থনা কর্, পরের ঘর কত্তে কত্তেই এই মাটীর দেহ যেন মাটীর সঙ্গে মিশে যায়।"

মেনী বসিয়া ছিল, যেন বিরক্তভাবে উঠিয়া দাঁড়াইল; গম্ভীরমুখে বলিল, "আচ্ছা আচ্ছা, সেই প্রার্থনাই করবো, আগে ঘরের কাজ-কর্ম্ম সারি।"

বলিয়া সে ঝাঁটাগাছটা হাতে লইয়া ব্যস্তহস্তে ঘর ঝাঁট দিতে প্রবৃত্ত হইল। নিস্তারিণী একটা দীর্ঘনিশ্বাস ত্যাগ করিয়া উঠিবার উপক্রম করিতেছিলেন, এমন সময় পদ্মঠাকরুণ "কি কচ্চিস্ লো মেনীর মা" বলিয়া বাটীর মধ্যে প্রবেশ করিলেন।



পদ্মঠাকরুণকে চিনিত না, গ্রামে এমন লোক নাই বলিলেই হয়। খুব বাল্যকালেই পদ্মঠাকরুণের বিবাহ হইয়াছিল, এবং বিবাহের অল্পকাল পরেই বিধবা হইয়া পিতৃগৃহে বাস করিতেছিলেন। চিরদিন পিতৃগৃহে বাস করায়, গ্রামের কোন লোকই তাঁহার অপরিচিত ছিল না! কাহারও দিদি, কাহারও পিসী, কাহারও মাসী সম্পর্ক লইয়া তিনি গ্রামের ইতর-ভদ্র সকলের গৃহেই ঘুরিয়া বেড়াইতেন, এবং পাঁচ বাড়ীর পাঁচ কথার আন্দোলনে দিন কাটাইতেন। শ্বশুরবাড়ীর সহিত তাঁহার কোন সম্পর্কই ছিল না; বাপ গোবর্দ্ধন চক্রবর্ত্তী জামাতার জমীজমা এমন কি, ঘর-ভিটা পর্য্যন্ত বেচিয়া আনিয়া সে স্থানের সহিত পদ্ম-ঠাকরুণের সকল সম্পর্ক ঘুচাইয়া দিয়াছিলেন। সেখানকার স্মৃতি

মন হইতে সম্পূর্ণরূপে মুছিয়া ফেলিয়া, বাপ, মা, ভাই, ভাইপো এই সকল লইয়াই পদ্মঠাকরুণ আপনার জীবনের সাধ আশা পূর্ণ করিতেছিলেন।

সাধারণতঃ যেমন দেখা যায়, বিধবাদিগকে পিত্রালয়ে নিতান্ত পরাধীনভাবেই বাস করিতে হয়, পদ্মঠাকরুণকে কিন্তু সেরূপ পরাধীনতার কষ্ট ভোগ করিতে হয় নাই। সংসারে তিনিই একরূপ কর্ত্রী ছিলেন; ভ্রাতা, ভ্রাতৃবধূ, এমন কি, মা-বাপ পর্য্যন্ত তাঁহার কর্তৃত্ব শিরোধার্য্য করিয়া লইতেন। শুধু নিজের বাড়ীতে নয়, গ্রামের অন্যান্য পাঁচ বাড়ীতেও তাঁহার কর্তৃত্ব অপ্রতিহত ছিল। গ্রামের কাহারও বাটীতে শ্রাদ্ধ-বিবাহাদি কাজকর্ম্ম হইলে পদ্মঠাকরুণ ছাড়া ভাঁড়ারীর ভার গ্রহণ করিবার আর কেহ ছিল না, করিলেও কার্য্য বেশ সুশৃঙ্খলে নির্ব্বাহিত হইত না। দশ-জন লোক খাওয়াইতে হইলে কি ভাবে খাওয়ান আবশ্যক, সে সম্বন্ধে লোকে আগে পদ্ম-ঠাকরুণের পরামর্শ গ্রহণ করিত, এবং সেই ন্যায্য পরামর্শ অনুসারে কাজ করিতে সকলেই বাধ্য হইত। তা ছাড়া সময়ে অসময়ে হাত পাতিলে পদ্মঠাকরুণের কাছে দুই-দশ টাকা পাওয়াও যাইত। এই কারণেও অনেকে তাঁহাকে ভয় ও ভক্তি করিয়া চলিত।

পদ্মঠাকরুণকে দেখিয়া নিস্তারিণী ব্যস্তভাবে উঠিয়া তাঁহাকে বসিতে আসন দিলেন। আসন গ্রহণ করিয়া পদ্মঠাকরুণ সহাস্যমুখে জিজ্ঞাসা করিলেন, "কেমন আছিস্ লো মেনীর মা!"

নিস্তারিণী বলিলেন, "আর দিদি, আমার আর থাকাথাকি কি, যেতে পারলেই বাঁচি।"

সহাস্য তিরস্কারের স্বরে পদ্মঠাকরুণ বলিলেন, "আ মরণ, যাবার জন্যে এত তাড়াতাড়ি কেন? যেতে তো হবেই একদিন। এখন যে

ক'দিন পারি থেকে যাই। গেলে আমিও তোকে 'মেনীর মা' ব'লে ডাক্‌তে আস্‌বো না, তুইও আমাকে বামুন দিদি ব'লে ডাকবি না।"

বিষাদগম্ভীর-মুখে নিস্তারিণী উত্তর করিলেন, "তা বটে, কিন্তু যেতে পারলে এই সব জ্বালা-যন্ত্রণার হাত এড়ান যায় দিদি।"

ঠোঁট ফুলাইয়া পদ্মঠাক্‌রুণ বলিলেন, "ইস্‌, ভারী তো তোর জ্বালা-যন্ত্রণা দেখছি! দেখ্‌ মেনীর মা, তোর মত যদি আমার একটা মেয়েও থাকতো, তা হ'লে আমি হাজার বচ্ছর বেঁচে থাক্‌তে চাইতুম।"

ঈষৎ হাসিয়া নিস্তারিণী বলিলেন, "কিন্তু সেই মেয়ের বিয়ে দিতে হ'লে একদণ্ডও বাঁচতে চাইতে না।"

নিতান্ত তাচ্ছীল্যের স্বরে পদ্মঠাক্‌রুণ বলিলেন, "ওঃ ভারী তো মেয়ের বিয়ে! ভাল কথা, তুই কি না কি একটা ষাট বছয়ের ঘাটের মড়ার সঙ্গে মেয়েটার বিয়ে দিবি?"

লজ্জানত মুখে নিস্তারিণী বলিলেন, "ষাট বছরের নয়, তবে চল্লিশ-পঞ্চাশ বটে।"

ঘাড় নাড়িয়া পদ্মঠাক্‌রুণ বলিলেন, "ও পঞ্চাশ আর ষাট একই কথা। কেন, তোর ঘরে কি একগাছা দড়ী আর একটা কলসী নাই? মেয়েটার গলায় কলসী বেঁধে তোদের খিড়কী-পুকুরের জলে ফেলে দিলি না কেন?"

গভীর দীর্ঘনিশ্বাস ত্যাগ করিয়া নিস্তারিণী বলিলেন, "কি করবো দিদি, যেমন কপাল! পয়সা থাকলে তো ভাল ছেলে পাব।"

রোষক্ষুব্ধকণ্ঠে পদ্মঠাক্‌রুণ বলিলেন, "সেই জন্যেই তো বলছি, মেয়েটার গলায় কলসী বেঁধে পুকুরের জলে ফেলে দে, তাতে এক পয়সাও খরচ হবে না।"

নিস্তারিণী নতমুখে নিরুত্তরে বসিয়া রহিলেন। পদ্মঠাক্‌রুণ জিজ্ঞাসা করিলেন, "তোকে এমন যুক্তি কে দিলে শুনি ?"

নিস্তারিণী বলিলেন, "যুক্তি আর কে দেবে দিদি, যুক্তি দেবার লোকই বা কে আছে ? তবে ঘোষেদের গিরির বাপের একটু নেক-নজর আছে, সে-ই অনেক চেষ্টার পর এই পাত্রটির যোগাড় করেছে।"

ভ্রূভঙ্গী সহকারে পদ্মঠাক্‌রুণ বলিলেন, "চমৎকার সু-পাত্র যোগাড় করেছে। কেন, তার শালার সঙ্গে কথাবার্ত্তা হয়েছিল না ?"

নিস্তারিণী বলিলেন, "হয়েছিল, কিন্তু সেটা ঘটে উঠলো কৈ ? উপেন হঠাৎ ক'লকাতা চ'লে গেল।"

পদ্মঠাকরুণ বলিলেন, "গেলেই বা ক'লকাতায়। ক'লকাতায় কি কেউ যায় না, না সেখান থেকে এসে বিয়ে করে না ?"

বিষাদ-মলিন স্বরে নিস্তারিণী বলিলেন, "কি জানি দিদি, ওঁরা তো জবাব দিয়ে গেলেন।"

পদ্মঠাকরুণ বলিলেন, "জবাব দিলেন, মেয়ে কালো ব'লে। তা মেয়ে কালো ব'লে কি বিয়ে হবে না ? জগতে সবাই কি সুন্দরী হয় ? গিন্নী নিজেই কি অপ্সরী না বিদ্যাধরী ?"

নিস্তারিণী বলিলেন, "নিজে মন্দ হ'লেও কেউ কি মন্দ জিনিস ঘরে আন্‌তে চায় ?"

পদ্মঠাক্‌রুণ বলিলেন, "তা হ'লেও যে যেমন দরের, সে তেমন জিনিস খুঁজলেই ভাল হয়। ছেঁড়া কাঁথায় শুয়ে লাখ টাকার স্বপন দেখলে লোকে বলবে কি ?"

নিস্তারিণী বিষণ্ণমুখে নীরবে রহিলেন। পদ্মঠাক্‌রুণ একটু ভাবিয়া বলিলেন, "আচ্ছা মেনীর মা, আমি একটু চেষ্টা ক'রে দেখি; কতদূর

কি কত্তে পারি। আমি শুনেছি, উপেনের চাকরী হয়েছে, নীলমণির বৌকে সে চিঠি লিখেছে। ছোঁড়াটা তার না কি খুব বাধ্য।"

নিস্তারিণী বলিলেন, "খুব বাধ্য যে, তা জানি, কিন্তু নিজের বোনের অমতে—"

তাঁহাকে ধমক্ দিয়া পদ্মঠাকরুণ বলিলেন, "আচ্ছা আচ্ছা, সে জন্যে তোকে ভাবতে হবে না, তুই মোদ্দা যেমন কথাবার্ত্তা হয়েছে, তেমনি বিয়ের যোগাড় কর্।"

উদ্বিগ্নভাবে নিস্তারিণী জিজ্ঞাসা করিলেন, "তার পর ?"

পদ্মঠাকরুণ বলিলেন, "তার পর কি হয়, দেখতে পাবি। তবে ভাই, বিধাতার ভবিতব্যি। তাঁর ভবিতব্যি যদি থাকে, তবে এক রকম যোটাযোট হয়েই যাবে। তুই ভাবিস্ না, আমি এখন নীলমণির বোয়ের কাছে চললুম।"

নিস্তারিণী তাঁহার পায়ের ধূলা লইয়া গদ্গদকণ্ঠে বলিলেন, "তা যদি পার দিদি—"

হাসিতে হাসিতে পদ্মঠাকরুণ বলিলেন, "আ মরণ, যদি পারি কি, নিশ্চয়ই পারবো বল্।"

হাসিতে হাসিতেই পদ্মঠাকরুণ চলিয়া গেলেন। নিস্তারিণী মনে মনে দেবতাকে স্মরণ করিয়া বলিলেন, "হে ঠাকুর, তাই যেন হয়।"

—২০—

"কি ভাবচ উপীনদা ?"

"ভাবচি এখনো কেন নলিনী এসে বলে নি, কি ভাবচো ?"

বামে-দক্ষিণে ঘাড় হেলাইয়া হাস্য-তরল-কণ্ঠে নলিনী বলিল, "তাই না কি, তুমি তা হ'লে ব'সে ব'সে আমার কথাই ভাবচো বল ?"

তাহার মুখের উপর সহাস্য দৃষ্টি নিক্ষেপ করিয়া উপেন বলিল, "তা ছাড়া আমার আর কি ভাবনা আছে, বলতে পার ?"

মুখে খানিকটা বিস্ময়ের ভাব আনিয়া নলিনী বলিল, "ও মা, আমার ভাবনা ছাড়া তোমার আর কিছু ভাবনা নাই ?"

মাথা নাড়িয়া উপেন বলিল, "কিচ্ছু নাই।"

"চাকরীর ভাবনা ?"

"সে ভাবনা যতক্ষণ আফিসে থাকি, ততক্ষণ।"

"বাড়ীর ভাবনা ?"

"বাড়ী-ঘর থাকলে তো সে ভাবনা থাকবে।"

"কেন, বোনের বাড়ী তো আছে ?"

"সে পরের বাড়ী।"

"বোনও কি পর ?"

"আপন হ'লে, বোনের বাড়ী ছেড়ে চ'লে আসবো কেন ?"

একটু ভাবিয়া নলিনী যেন ঈষৎ ব্যথিতকণ্ঠে জিজ্ঞাসা করিল, "তা হ'লে তোমার আপন ব'লে কেউ নাই বল উপীনদা ?"

উপেন বলিল, "থাক্‌লে তাদের ভাবনা ভাবতাম বৈ কি।"

"তা হ'লে আমার ভাবনাই বা কেন ভাব ?"

"তোমরা আমাকে আপন ভাব ব'লে।"

হর্ষ-প্রফুল্ল-মুখে নলিনী বলিল, "আমরা কি তোমাকে এতই আপন ভাবি উপীনদা ?"

সহাস্যে উপেন বলিল, "আমার তো তাই মনে হয়।"

"সত্যি ?"

"সত্যি।"

"আচ্ছা, কেন এমন মনে হয় বল দেখি ?"

ঈষৎ হাসিয়া উপেন উত্তর করিল, "কি জানি।"

নলিনী দাঁড়াইয়াছিল, ধপ্ করিয়া উপেনের বিছানার একপাশে বসিয়া পড়িল, এবং উপেনের মুখের উপর হাস্যোজ্জ্বল দৃষ্টি নিক্ষেপ করিয়া বলিল, "তুমি জান না, আমি কিন্তু জানি।"

একটু আগ্রহের সহিত উপেন জিজ্ঞাসা করিল, "কি জান তুমি?"

নলিনী বলিল, "মা বলেন, আর জন্মে তুমি আমাদের কেউ ছিলে, তাই তোমার উপর এত ভালবাসা পড়েছে।"

উপেন যেন একটু শিহরিয়া উঠিল; বলিল, "আর জন্মে ছিলাম, তা এ জন্মে ভালবাসা হবে কেন?"

মাথাটা একটু হেলাইয়া, ভ্রূদ্বয় ঈষৎ কুঞ্চিত করিয়া নলিনী বলিল, "তাই তো হয় গো! আমি পড়েছি—মনোহি জন্মান্তরসঙ্গতিজ্ঞঃ।"

উপেন জিজ্ঞাসা করিল, "তার মানে?"

নলিনী বলিল, "তার মানে হচ্চে, পূর্ব্বজন্মে যার সঙ্গে ভালবাসার সম্পর্ক থাকে, এ জন্মে তাকে দেখলেই মন তার দিকে অনুরক্ত হয়ে পড়ে।"

হাসিতে হাসিতে উপেন বলিল, "তা হ'লে পূর্ব্বজন্মে আমার সঙ্গে কি রকম সম্পর্ক ছিল, বল দেখি পণ্ডিত মশায়?"

একটু লজ্জার হাসি হাসিয়া নলিনী বলিল, "এই তো! আমি ভাল কথা বললেই তুমি আমাকে ঠাট্টা-বিদ্রূপ কর।"

হাস্য-তরল-কণ্ঠে উপেন বলিল, "আর তোমারও ঐ এক দোষ, আমি কিছু বল্‌লেই তুমি সেটাকে ঠাট্টা-বিদ্রূপ মনে কর। কা'ল বিয়ের কথা কইলুম, তুমি ঠাট্টা মনে ক'রে রেগে উঠলে।"

চক্ষু বিস্ফারিত করিয়া যেন খুব আশ্চর্য্যান্বিতভাবে নলিনী বলিল,

"বাঃ, রেগে উঠলাম আবার কখন্? আমি তো বল্লাম, ও-কথা শুন্‌তে আমার ভাল লাগে না।"

উপে। ভাল লাগে না কেন?

নলি। কেন, তা কি জানি।

উপে। বিয়ের কথা শুনলে লজ্জা হয় বুঝি?

নলি। লজ্জা! না না, লজ্জা হবে কেন? এমন লজ্জার কথাটাই বা কি।

উপে। তবে ভাল লাগে না কেন? বিয়ে করবে না?

নলি। যদি না-ই করি?

উপে। তাও কি হ'তে পারে?

নলি। হ'তে পারে না কেন, সেইটাই আগে আমাকে বুঝিয়ে দাও দেখি?

উপেন একটু মুস্কিলে পড়িল। বিবাহ যে করিতেই হয়, না করিলে চলে না, ইহা বুঝাইয়া দিবার মত বিজ্ঞতা তাহার ছিল না। সুতরাং খানিক ইতস্ততঃ করিয়া সে বলিল, "এই তো সকলেই বিয়ে করে।"

নলিনী বলিল, "অনেকেই করে না।"

উপে। পুরুষ কেউ কেউ অবিবাহিত থাকে বটে।

নলি। মেয়েমানুষও অনেক থাকে। এই তো আমাদের কলেজের হেড-মিষ্ট্রেস্ মিস্ এলিস্ বিবাহ করেন নি।

উপে। ও সাহেবদের মেয়েদের কথা ছেড়ে দাও।

নলি। সাহেবদের মেয়েরা কি মেয়েমানুষ নয় উপীনদা?

উপেন ইহার উত্তরে বলিবার মত কিছু খুঁজিয়া পাইল না; অগত্যা বলিল, "ওদের মেয়ে-পুরুষ চেনা দায়। ওরা পুরুষদের সঙ্গে এক টেবিলে ব'সে খানা খায়, চাকরী করে, গাড়ী হাঁকিয়ে বেড়াতে যায়।"

নলিনী খিল্ খিল্ করিয়া হাসিয়া উঠিল; হাসিতে হাসিতে বলিল, "চাকরী করে, খানা খায় ব'লে ওদের বিয়ের দরকার নাই উপীনদা ?"

তাহার এই উচ্চ হাসিতে লজ্জিত হইয়া উপেন মাথা নীচু করিল। নলিনী কিছুক্ষণ চুপ করিয়া থাকিয়া ধীরে ধীরে ডাকিল, "আচ্ছা উপীনদা !"

উপেন মুখ তুলিয়া চাহিল। নলিনী একটু ইতস্ততঃ করিয়া নত-মুখে জিজ্ঞাসা করিল, "বিয়ে কেন উপীনদা ?"

উপেন মৃদু হাসিয়া বলিল, "এটা মন্দ প্রশ্ন নয় নলিনী !"

গম্ভীরভাবে মাথা নাড়িয়া নলিনী বলিল, "মন্দই হোক্, আর ভালই হোক্, তুমি আমাকে বুঝিয়ে দাও।"

উপেন বলিল, "এর আর বোঝাবার কি আছে ? সংসারে থাক্‌তে হ'লে বিয়ে করা দরকার।"

নলি। বিয়ে না করলে কি সংসারে থাকা যায় না ?

উপে। থাকা যাবে না কেন, সে যেন উদাসীনের মত থাক্‌তে হয়।

নলি। উদাসীনের মত কেন ?

উপে। উদাসীনের মতই বৈ কি। মানুষ ভালবাসার বাঁধনেই সংসারে আবদ্ধ হয়ে থাকে। যাঁর সে বাঁধন নাই, তাকে উদাসীন ছাড়া আর কি বলা যায় ?

নলিনী। তা বিয়ে না হ'লে কি ভালবাসা যায় না ? এই যে আমি মাকে ভালবাসি, তোমাকে ভালবাসি।

নলিনীর কথায় উপেনের মুখখানা আরক্ত হইয়া উঠিল। সে একটা ঢোক গিলিয়া বলিল, "এ ভালবাসায় আর স্বামী-স্ত্রীর ভালবাসায় অনেক তফাৎ নলিনী ! স্বামী-স্ত্রীর মধ্যে এমন ভালবাসা জন্মে যে, স্বামী বা স্ত্রী পরস্পর অর্দ্ধাঙ্গ হ'য়ে যায়।"

ঈষৎ হাসিয়া নলিনী বলিল, "বল কি, একেবারে আধখানা অঙ্গ!"

উপেন বলিল, "হাঁ, আধখানা অঙ্গ। এই জন্যেই স্ত্রীকে অর্দ্ধাঙ্গিনী বলে।"

হাসিতে হাসিতে নলিনী বলিল, "আমাদের পণ্ডিত মশায় কিন্তু ব'লে দিয়েছেন, অর্দ্ধাঙ্গিনী কথাটা ব্যাকরণের মতে অশুদ্ধ।"

উপেন বলিল, "আমি ব্যাকরণও পড়ি নাই, এত শুদ্ধ অশুদ্ধও জানি না। লোকে বলে, তাই শুনেছি।"

ঘাড় বাঁকাইয়া একটু উপহাসের হাসি হাসিয়া নলিনী বলিল, "ওঃ, এ সব তা হ'লে তোমার শোনা কথা?"

ঈষৎ অপ্রতিভভাবে উপেন বলিল, "শোনা কথা বৈ কি। আমার তো এখনও বিয়ে হয় নি যে, পরখ ক'রে দেখেছি।"

"তবে তুমি আগে বিয়ে কর উপীনদা, তার পর তোমার উপদেশ শুনবো।"

বলিয়া নলিনী হাসিতে হাসিতে ঘরের বাহির হইয়া গেল। উপেন একটা ক্ষুদ্র নিশ্বাস ত্যাগ করিয়া নীরবে বসিয়া ভাবিতে লাগিল।



"হাঁ নলি, উপেনকে বলেছিস্, তুই নাকি বিয়ে করবি না?"

নলিনী নতমুখে দাঁড়াইয়া নখ খুঁটিতে লাগিল। মা যেন একটু তিরস্কারের স্বরে বলিলেন, "কেন বিয়ে করবি না বল্ তো?"

নলিনী নীরব! তাহার চোখে মুখে লজ্জার রক্তরাগ ফুটিয়া উঠিল। মা এবার মেয়ের লজ্জারক্ত মুখের উপর রোষকঠিন দৃষ্টি স্থাপন করিয়া তীব্র কণ্ঠে বলিলেন, "এর তরেই বুঝি তোকে লেখাপড়া শিখিয়েছি?"

মৃদুস্বরে নলিনী উত্তর করিল, "বিয়ে দেবার তরেই কি লেখাপড়া শিখিয়েছ মা?"

তর্জ্জন সহকারে মা বলিলেন, "তা নয় তো চাকরী ক'রে পয়সা আন্‌বার তরে কি তোর পেছনে এত পয়সা খরচ করেছি?"

নলিনী বলিল, "চাকরী করবো, এ কথা তো বলি নাই মা।"

মা বলিলেন, "কিন্তু বিয়ে করবো না বলেছিস্ তো?"

নলিনী চুপ করিয়া দাঁড়াইয়া রহিল। গম্ভীরভাবে মা বলিলেন, "তোকে কেন লেখাপড়া শিখিয়েছি, তা জানিস্?"

নলিনী জিজ্ঞাসা করিল, "কেন শিখিয়েছ মা?"

মা বলিলেন, "তোর রূপ যা হোক একটু আছে, তার উপর একটু লেখাপড়া শিখে চালাক চতুর হ'তে পারলে, কোন না কোন ভদ্র-লোকের ছেলে তোকে বিয়ে কত্তে পারবে।"

"তা নইলে?"

"তা নইলে বেশ্যার মেয়ে তুই,—কোন্ ভদ্রলোক তোকে ঘরে ঠাঁই দেবে বল্ তো?"

নলিনীর আরক্ত মুখখানা হঠাৎ যেন ঘোর লাল হইয়া উঠিল। তীব্র কণ্ঠে ডাকিল, "মা!"

মা মেয়ের এই সক্রোধ আহ্বানের মর্ম্ম বুঝিতে পারিলেন। বুঝিয়া বলিলেন, "তা রাগ করলে কি হবে বাছা, যতই গেরস্তর মত সাবধানে থাকি, আমি বেশ্যা ছাড়া আর কিছু তো নই?"

ক্রোধগম্ভীর মুখে নলিনী বলিল, "তুমি বেশ্যাই হও, আর যাই হও, আমি ও সব কথা শুন্‌তে চাই না।"

মা একটু হাসিলেন; বলিলেন, "শুনলে তোর খুব লজ্জা হয়, না?"

ছলছল চোখে নলিনী উত্তর করিল, "আমার মাথা যেন কাটা যায়।"

শান্ত কোমল কণ্ঠে মা বলিলেন, "তা আমি জানি নলি। জানি ব'লেই যখন হ'তে তোর একটু জ্ঞানবুদ্ধি হয়েছে, তখন হতেই এ পাপ ব্যবসা ছেড়ে দিয়ে পল্লীতে বাস কচ্চি। পাছে তোর মনে আঘাত লাগে, পাছে আমাকে 'মা' ব'লে ডাকতেও তোর মনে একটু ঘৃণা আসে, এই আশঙ্কায় কত হাজার হাজার টাকার লোভ সংবরণ করেছি, কত রাজা ও জমিদারকে এই বাড়ীর দরজা থেকে ফিরিয়ে দিয়েছি, তা বোধ হয় তুই জানিস্ না। আজ আমি এই ভাড়াটে বাড়ীতে বাস কচ্চি, কিন্তু ইচ্ছা করলে এর চেয়ে ভাল ভাল বাড়ী কিনে ফেলতে পারতাম। কিন্তু শুধু তোর তরেই নলি, আমি সে লোভ সংবরণ ক'রে আসছি।"

স্নেহের উচ্ছ্বাসে মাতার চোখ দুইটা সজল হইয়া আসিল। মেয়ের মুখের উপর স্নেহপ্রদীপ্ত দৃষ্টি স্থাপন করিয়া মা বলিতে লাগিলেন, "তবে বল্‌তে পারিস্, থিয়েটার কচ্চো কেন তবে? থিয়েটার কচ্চি কেন জানিস্? এটা হচ্চে মোটা মাইনের চাকরী, দশ বিশ হাজার তো জমা নাই যে, তাই ভেঙে খাব। কাজেই এই চাকরী কত্তে হচ্চে।"

নলিনী জিজ্ঞাসা করিল, "এ চাকরীতেও কি দোষ নাই মা?"

মা বলিলেন, "দোষ আছে বল্‌লেই আছে, নাই বল্‌লে নাই। কিন্তু দোষ থাক্ আর নাই থাক্ দিন চালাবার একটা উপায় তো চাই।"

নলি। এ ছাড়া কি অন্য উপায় নাই?

মা। এ ছাড়া আমাদের আর কি উপায় আছে নলি? এক উপায় ভিক্ষা করা। কিন্তু ভিক্ষা ক'রে খাব, এ কথা বলা যত সহজ, কাজে ততটা সহজ নয়। আর ততটা কষ্ট আমিও সইতে পারবো না, তুইও সইতে পারবি না। তার চাইতে গতর খাটিয়ে খাচ্চি, এতে লোকনিন্দা একটু থাকলেও ধর্ম্মের কাছে পতিত হব না নলি।"

নলিনী নীরবে নতমুখে দাঁড়াইয়া রহিল। মা বলিতে লাগিলেন, "তা পাপই হোক আর পুণ্যই হোক, আমার যা হয় হবে নলি, এখন তোকে সুখী কত্তে পারলেই আমার জীবন সার্থক। তোর বিয়ে দেব, তুই ভদ্র গেরস্ত ঘরের মেয়ের মত স্বামী-পুত্র নিয়ে সুখে ঘর-কন্না করবি, নরকে থেকেও যদি আমি তোর এই সুখটুকু দেখতে পাই, তা হ'লে তোর সে সুখের কাছে আমার নরক-যন্ত্রণাও তুচ্ছ হয়ে যাবে। তুই আমার এ সাধে বাদ সাধিস্ না নলি।"

মাতার স্নেহকরুণ উক্তিতে নলিনীর প্রাণটা যেন কেমন করিয়া উঠিল।...মা, মা! স্নেহময়ী—মঙ্গলময়ী মা! কন্যার সুখের জন্য তোমার এত ব্যাকুলতা! তোমার এই ব্যাকুলতা কি দূর হইতে পারে না মা? গাঢ় কণ্ঠে নলিনী বলিল, "কিন্তু মা,—"

মা জিজ্ঞাসা করিলেন, "কি বলছিস্ নলি?"

নলিনী একটু ইতস্ততঃ করিয়া বলিল, "কিন্তু বিয়ে হ'লে তোমার কাছে তো থাকতে পারবো না!"

নলিনীর বিবাহে অনিচ্ছার কারণ শুনিয়া মা হাসিয়া উঠিলেন; বলিলেন, "আ পাগলী মেয়ে, এই জন্যে তুই বিয়ে কত্তে চাস্ না?"

ঘাড় দোলাইয়া ভারী মুখে নলিনী বলিল, "না মা, তোমাকে ছেড়ে আমি থাকতে পারবো না।"

সহাস্য মুখে মা বলিলেন, "তুই আমাকে ছেড়ে থাকতে পারবি না, আর আমিই কি তোকে ছেড়ে থাকতে পারবো মনে করিস্?"

বিবাহ হইলেই মেয়েমানুষকে স্বামীর ঘরে যাইতে হয়, নলিনী ইহা জানিত, সুতরাং মায়ের কথায় সে একটু আশ্চর্য্য বোধ করিল, এবং বিস্ময়পূর্ণ নেত্রে মাতার মুখের দিকে চাহিয়া রহিল।

মা বলিলেন, "তার উপায় আমি আগেই ক'রে রেখেছি নলি।

এ ভাবনাটা আমার বড্ডই ছিল, কিন্তু ভগবান্ সে ভাবনা ঘুচিয়ে দিয়েছেন; তাঁর কৃপায়, বিপদের মধ্যে উপেনকে রাস্তায় কুড়িয়ে পেয়েছি।”

তবে কি উপেনের সঙ্গেই তাহার বিবাহ হইবে? উপীনদা তাহার স্বামী? লজ্জা-জড়িত আনন্দে নলিনীর মুখমণ্ডল আরক্ত হইয়া উঠিল। মা, মেয়ের মুখভাব লক্ষ্য করিয়া হর্ষপ্রফুল্লকণ্ঠে বলিলেন, “আমি যেমনটি চাই, তেমনটীই পেয়েছি। তিন কুলে কেউ নাই, ঘরজামাই হয়ে থাকতে একটুও আপত্তি করবে না।”

আনতমুখে, লজ্জাজড়িতস্বরে নলিনী বলিল, “আপত্তি যে করবে না, তাই বা তুমি কেমন ক’রে জানলে মা?”

মা বলিলেন “ওর কথাবার্ত্তার আঁচে বুঝে নিয়েছি। একদিন উপেনের কাছে তোর বিয়ের কথা পেড়েছিলুম। অবশ্য, ওকেই যে পাত্র মনোনীত করেছি, সে কথা বলি নাই, তবে তেমন ভাল ছেলে কোথায় পাওয়া যায়, কি ক’রে নলিকে পার করবো, এই রকম ভাবের কথা পেড়েছিলুম। তাতে উপেন বল্‌লে কি জানিস্?—নলিনীর বিয়ের জন্যে ভাবনা কি? যার অনেক সৌভাগ্য, সে-ই, নলিনীকে লাভ কত্তে পারবে।”

নলিনী বুকের ভিতর দ্রুত স্পন্দন অনুভব করিতে লাগিল। মা বলিলেন, “তুই না জানতে পারিস্ নলি, আমি কিন্তু বেশ বুঝেছি, উপেন তোর রূপে-গুণে মুগ্ধ।”

ভ্রূকুঞ্চন সহকারে নলিনী বলিল, “রূপে-গুণে মুগ্ধ ব’লেই যে বিয়ে কত্তে যাবে, তার কোন মানে নাই।”

মা। খুব মানে আছে। দেখ, ব্যবসা ছেড়ে দিয়েছি বটে, কিন্তু লোকের মনের ভাব এখনো এক কথায় বুঝতে পারি। উপেন

তোকে প্রাণের সঙ্গে ভালবাসে। ও যদি তোকে পায়, তবে মনে করবে, হাত বাড়িয়ে স্বর্গ পেয়েছি।

মায়ের কথায় নলিনীর মুখখানা গম্ভীর হইয়া আসিল। ভ্রূকুটি করিয়া বলিল, "কিন্তু ছি মা, লোককে ভুলিয়ে স্বার্থসিদ্ধি করা—আমি তো বেশ ভাল বলি না।"

মায়ের হর্ষপ্রফুল্ল মুখে এবার যেন একটু রাগের ভাব দেখা দিল; তিনি মেয়েকে ধমক্ দিয়া বলিলেন, "একরত্তি মেয়ে তুই, তোর এত ভাল-মন্দ বিচার কেন বল্ তো? এ রকমে ভুলিয়ে কাজ হাসিল না করলে কোন্ ভদ্র ঘরের ছেলে বেশ্যার মেয়েকে বিয়ে কত্তে আসবে বল্‌তে পারিস্?"

নলিনীও একটু রাগতভাবে বলিল, "না এলেই ক্ষতি কি?"

মা বলিলেন, "তোর ক্ষতি না থাকলেও আমার ক্ষতি আছে। দেখ নলি, আমি ব্যাগত্তা ক'রে বলছি, তুই যদি এতে অমত করিস, তা হ'লে আমি গঙ্গায় ঝাঁপ দিয়ে মরবো।"

মাতার এই আক্ষেপোক্তির উত্তরে নলিনী আর কিছু বলিতে পারিল না। সে নিরুত্তরে কিছুক্ষণ দাঁড়াইয়া থাকিয়া ধীরে ধীরে পড়িবার ঘরের দিকে চলিয়া গেল।

—২২—

সেইদিন উপেন আফিস হইতে ফিরিয়া আহারে বসিয়াছিল। নলিনীর মা তাহার সম্মুখে বসিয়া গল্প করিতে করিতে তাহার আহারের তত্ত্বাবধান করিতেছিলেন। কত কষ্টে তিনি নলিনীকে মানুষ করিয়াছেন, কঠিন রোগে আক্রান্ত হইয়া তাঁহার এই শিবরাত্রির

সলিতাটুকু কতবার মরণাপন্ন হইয়াছে, জীবন পর্য্যন্ত পণ করিয়া কত কষ্টে তিনি নলিনীকে যমের মুখ হইতে টানিয়া আনিয়াছেন, এখন মেয়েটাকে কোন সৎপাত্রের হস্তে অর্পণ করিতে পারিলেই তিনি নিশ্চিন্ত হইয়া কাশীবাস করেন, ইত্যাদি সুখদুঃখের কথা আক্ষেপ সহকারে ব্যক্ত করিতে লাগিলেন। তারপর উপেনকে আর খান দুই রুটী এবং দুধের বাটি দিয়া যাইবার জন্য বামুন ঠাকুরকে আদেশ দিয়া উপেনকে সম্বোধন করিয়া বলিলেন, "তা বাবা, মেয়েটার বিয়ের কি করি বল দেখি? বৌ-বাজারে তো একটি ছেলের সন্ধান পেয়েছি। ছেলেটি লেখাপড়া একটু জানে বটে, কিন্তু স্বভাবচরিত্র তেমন ভাল নয়।"

উপেন ততক্ষণ নতমুখেই নলিনীর মাতার কাহিনী শুনিয়া যাইতেছিল; এক্ষণে মুখ তুলিয়া বলিয়া উঠিল, "যার স্বভাবচরিত্র ভাল নয়, তেমন ছেলের হাতে কখনও মেয়ে দেওয়া যেতে পারে না।"

চিন্তাগম্ভীর মুখে নলিনীর মা বলিলেন, "সে কথা আমিও বুঝি উপেন, কিন্তু তেমন ছেলে পাওয়া যাচ্চে কোথায়? লেখাপড়া জানবে, স্বভাবচরিত্র ভাল হবে, অথচ ঘরজামাই হয়ে থাকবে, এমন ছেলে তো চোখে ঠেকে না। ঘটকী মাগী তো আজ এক রকম জবাব-ই দিয়ে গেল।"

উত্তেজিত কণ্ঠে উপেন বলিল, "দিক্ জবাব। সে জবাব দিচ্চে ব'লে কি লম্পট মাতালের হাতে মেয়ে দিতে হবে?"

তাহার ভ্রূকুটিপূর্ণ মুখের দিকে চাহিয়া মৃদুহাস্যসহকারে নলিনীর মা বলিলেন, "তা বাবা, এই ক'লকাতা সহরে ক'টা লোক মাতাল— ক'টা ছেলে নেশাখোর নয়? এক তুমি ছাড়া তেমন ছেলে তো দেখতেই পাই না।"

উপেন মাথাটা নীচু করিয়া নীরবে আহারকার্য্য সম্পন্ন করিতে লাগিল। নলিনীর মা বলিলেন, "কিন্তু তোমার মত ছেলের হাতে দেব, তেমন কপাল ক'রে আমি এসেছি কি?"

উপেনের গাম্ভীর্য্যপূর্ণ মুখের উপর দিয়া যেন একটা শিহরণের হঠাৎ চমকিয়া গেল। তাহা লক্ষ্য করিয়া ঈষৎ উৎফুল্ল কণ্ঠে নলিনীর মা বলিলেন, "যে দিন থেকে তোমাকে কুড়িয়ে পেয়েছি, সে দিন থেকেই বড় সাধ, তোমাকে যেমন আপন ভেবে আসছি, তেমনি খুব আপনার ক'রে ফেলি। কিন্তু সেটা মুখ ফুটে বল্‌তে তো সাহস হয় নি।"

মুখ না তুলিয়াই যেন নিতান্ত ব্যগ্রকণ্ঠে উপেন জিজ্ঞাসা করিল, "কেন সাহস হয় নি?"

নলিনীর মা বলিলেন, "কি জানি বাবা, পরের ছেলে, কি মনে করবে। হয় তো ভাববে, নিজের স্বার্থসিদ্ধির জন্যেই এরা এতটা স্নেহযত্ন দেখাচ্চে।"

উপেন বলিল, "মনে মনে পর ভেবে রাখলে এ ভয়টা আস্‌তেই পারে।"

একটু লজ্জার হাসি হাসিয়া নলিনীর মা বলিলেন, "আমাকে ঠকিয়েছ বাবা, কিন্তু শুধু যে পর ভাবি ব'লেই কথাটা বল্‌তে পারি নাই, তা নয়।"

উপেন জিজ্ঞাসা করিল, "তা ছাড়া বল্‌বার আর কি বাধা আছে?"

নলিনীর মা মাথাটা নীচু করিলেন এবং নিতান্ত বেদনাজড়িত কণ্ঠে বলিলেন, "বাধা একটু আছে বৈ কি বাবা, নলি আমার ফুটন্ত পারিজাতফুল। কিন্তু কপালদোষে সে ফুল কাঁটা গাছে জন্মেছে।"

তাঁহার বক্তব্যটুকু বুঝিয়া লইতে উপেনের বিলম্ব হইল না। বুঝিবামাত্র তাহার হর্ষপ্রফুল্ল মুখমণ্ডল মুহূর্ত্তের জন্য বিষাদের অন্ধকারে মলিন হইয়া আসিল। কিন্তু মুহূর্ত্ত পরেই তাহা প্রফুল্লতায় প্রোজ্জ্বল হইয়া উঠিল। প্রদীপ্তমুখে উপেন বলিল, "ভাল ফুল প্রায় কাঁটাগাছেই জন্মে থাকে, আর তাকে পেতে হলেই কাঁটার আঘাত সহ্য কত্তেই হয়।"

আশাপ্রফুল্লস্বরে নলিনীর মাতা বলিলেন, "তা হ'লে কি বাবা, এ কাঁটার আঘাত তুচ্ছ জ্ঞান ক'রে আমার নলিকে গ্রহণ কত্তে প্রস্তুত আছ?"

এই প্রশ্নের উত্তর উপেন সহসা দিতে পারিল না। দরিদ্র ভিক্ষুকের সহসা লক্ষপতি হইবার সম্ভাবনা হইলে, অতিশায়িত আনন্দের আবেগে যেমন তাহার বাক্শক্তি রুদ্ধ হইয়া যায়, বামন সহসা পূর্ণিমার চাঁদকে কাছে পাইলে হর্ষে বিস্ময়ে যেমন তাহার ইন্দ্রিয়ের ক্রিয়াশক্তি রুদ্ধ হইয়া আইসে, উপেন্দ্রের অবস্থাও অনেকটা সেইরূপ হইয়া আসিল। বিস্ময়-বিজড়িত আনন্দে তাহার বক্ষের স্পন্দন এত দ্রুততর হইয়া আসিল যে, তাহার মনে হইল, বক্ষের সে দ্রুত স্পন্দনশব্দ বুঝি নলিনীর মাতার কাছেও গোপন থাকিতেছে না। অভূতপূর্ব্ব বিস্ময়ানন্দে বিমূঢ় হইয়া উপেন যেন স্পন্দনহীনের ন্যায় রুদ্ধশ্বাসে বসিয়া রহিল।

নলিনীর মাতা তাহার স্তব্ধমুখের উপর তীক্ষ্ণদৃষ্টি স্থাপন করিয়া পুনরায় জিজ্ঞাসা করিলেন, "তা হ'লে উপেন, নলিনীকে তুমি পায়ে রাখবে, এমন আশা কি আমি কত্তে পারি?"

উপেন বহুকষ্টে হৃদয়ের আবেগটাকে চাপিয়া, ধরা গলায় উত্তর দিল, "কিন্তু মা, আমি কি নলিনীর যোগ্য পাত্র?"

নলিনীর মা হাসিয়া উঠিলেন; বলিলেন, "ক্ষ্যাপা ছেলের কথা শোন। যাক্, কা'ল তা হ'লে পুরুত ঠাকুরকে ডাকিয়ে দিন ঠিক ক'রে ফেলি। শুভকাজে বিলম্ব করা ভাল নয়।"

নলিনীর মা একটা আরামের নিশ্বাস ত্যাগ করিলেন। উপেন এক চুমুকে দুধের বাটিটা খালি করিয়া উঠিয়া পড়িল।

সে দিন উপেন আর নলিনীর ঘরে গিয়া গল্প করিতে বসিল না; আহারান্তে নিজের ঘরে আসিয়া শুইয়া পড়িল।

কি আশ্চর্য্য, যে নলিনীকে সে কত দূরে দেখিয়াছিল, সেই নলিনী তাহার এত কাছে? যাহাকে পাইবার আশা সে একদিন মনের ভিতরে আনিতেও সাহস করে নাই, কোন দিন স্বপ্নেও ভাবিতে পারে নাই, সেই নলিনী তাহার হস্তগত! নলিনীকে লাভ করিবার সৌভাগ্য শুধু তাহার একটা ইঙ্গিতের অপেক্ষা করিতেছিল মাত্র! ইহা সত্য না স্বপ্ন? সত্য হইলেও ঠিক যেন স্বপ্নের মতই মনে হয়। এই রূপগুণশালিনী সদানন্দময়ী নলিনী তাহার স্ত্রী হইবে, এমন সৌভাগ্যের কথা সে যে ভাবিতেই পারে না! একদিন তাহারই সহিত মেনীর— সেই কুৎসিত মেয়েটার বিবাহের কথা হইয়াছিল, আর তাহা লইয়া গৌরী কতই না উপহাস করিয়াছিল, গাঁটছড়া পর্য্যন্ত বাঁধিয়া দিয়াছিল। আজ গৌরী কোথায়? উপেনের ইচ্ছা হইল, সে ছুটিয়া গিয়া গৌরীকে ডাকিয়া আনে, এবং নলিনীকে দেখাইয়া, গৌরীর উপহাসের প্রত্যুত্তরে কঠোর উপহাসের হাসি হাসিয়া বলে, "দেখ্ গৌরি, আমার ক'নে দেখ্! তুই বলেছিলি, মেনীই আমার উপযুক্ত ক'নে। কিন্তু দেখ্, আমার উপযুক্ত ক'নে কে;—তার সাম্‌নে তুইও দাঁড়াতে পারবি না।"

গৌরীকে যেন সম্মুখে রাখিয়া, তাহাকে আপনার ভাবী পত্নীর সৌন্দর্য্য দেখাইতে দেখাইতে উপেন প্রাণের ভিতর একটা অস্বাভাবিক

উল্লাস উপভোগ করিতে লাগিল, এবং গৌরীর লজ্জাবিমলিন মুখখানা তাহার সেই কল্পিত আনন্দের মাত্রাকে আরও বর্দ্ধিত করিয়া দিল।

নলিনী তখন নিজের ঘরে বসিয়া গাহিতেছিল,—

"বঁধূয়া, কি আর কহিব আমি।

জনমে জনমে জীবনে মরণে প্রাণনাথ হ'য়ো তুমি।"

উপেন কান খাড়া করিয়া, রুদ্ধশ্বাসে শুনিতে থাকিল, নলিনী যেন তাহাকে উদ্দেশ্য করিয়া প্রার্থনাকাতর কণ্ঠে গাহিতেছে—

"তোমার চরণে আমারি পরাণে লাগিল প্রেমের ফাঁসি,

কুল-লাজ-ভয় সকলি তেয়াগি হইনু তোমারি দাসী।"

উপেনের হৃদয়ে সপ্ত সমুদ্রের তরঙ্গ উঠিতে পড়িতে থাকিল, এবং সেই তরঙ্গে আপনাকে ভাসাইয়া দিয়া সে স্বপ্নরাজ্যে বিচরণ করিতে লাগিল।

পরদিন উপেন আপিসে বসিয়া গৌরীকে একখানা চিঠি লিখিল—

"গৌরি, আস্‌ছে রবিবারে আমার বিয়ে; তোমার গাঁটছড়া বাঁধবার নিমন্ত্রণ রইলো। একদিন তুমি মেনীর সঙ্গে মিথ্যা গাঁটছড়া বেঁধে দিয়েছিলে, কিন্তু এবার যার সঙ্গে আমার সত্যিকার গাঁটছড়া বাঁধা হবে, তাকে দেখলে লজ্জায় তুমি গলায় দড়ী দেবে কি না, জানি না। তা তুমি লজ্জায় গলায় দড়ীই দাও, আর রাগে ঘরের ভাত বেশীই খাও, অবশ্য অবশ্য এসে নিমন্ত্রণ রক্ষা করবে। ইতি

—তোমার উপীনদা।"

পত্রখানা ডাকে ফেলিয়া দিয়া উপেন মনে মনে যথেষ্ট আমোদ উপভোগ করিতে লাগিল।

—২৩—

"তোমার চিঠি এয়েচে উপীনদা!"

উপেন ব্যস্ততা সহকারে নলিনীর হাত হইতে চিঠিখানা লইয়া খাম ছিঁড়িয়া পড়িতে আরম্ভ করিল। পড়িতে পড়িতে তাহার মুখখানা তরল হাস্যে প্রোজ্জ্বল হইয়া উঠিল। নলিনী জিজ্ঞাসা করিল, "কার চিঠি উপীনদা?"

চিঠির উপর হইতে মুখ না তুলিয়াই উপেন উত্তর দিল, "গৌরীর চিঠি।"

"গৌরী কে?"

পত্রপাঠ শেষ করিয়া উপেন সংক্ষেপে গৌরীর পরিচয় দিল। নলিনী জিজ্ঞাসা করিল, "সে এমন কি লিখেছে যে, তাই প'ড়ে তুমি এত হাসচো?"

উপেন বলিল, "হাসির কথাই লিখেছে, তাই হাসচি। প'ড়ে দেখ না।"

উপেন চিঠিখানা নলিনীর হাতে দিল। মোটা মোটা আঁকা-বাঁকা অক্ষরে লেখা চিঠিখানার উপর কৌতূহলপূর্ণ দৃষ্টি নিক্ষেপ করিয়া নলিনী পড়িতে লাগিল,—

"আড়ি, আড়ি, আড়ি! আমার ঘটকালি বুঝি তোমার পছন্দ হ'লো না উপীনদা, তাই তুমি নিজে সুন্দরী ক'নে পছন্দ ক'রে আমাকে গাঁটছড়া বাঁধবার নেমন্তন্ন করেছ? বোয়ে গেছে আমার গাঁটছড়া বাঁধতে, আমি তোমার নেমন্তন্ন ফিরিয়ে দিলুম। যাকে দেখলে লজ্জায় আমার গলায় দড়ী দিতে ইচ্ছা হবে, আমি যাব তার গাঁটছড়া বাঁধতে! তুমি তোমার সুন্দরী ক'নে নিয়ে থাক, আমি আমার গাঁটছড়ার সরঞ্জাম শিকেয় তুলে রাখলুম।

"কি এমন সুন্দরী গা; যার রূপ দেখে তুমি আমাকে গলায় দড়ী দিতে বলেছ? আরে আমার সুন্দরী রে! শুনতে পাই, মানুষ কামরূপে গেলে সেখানকার ডাকিনীরা তাকে ভেড়া ক'রে রাখে। ক'লকাতাতেও না কি ঐ রকম ডাকিনী অনেক আছে। তুমি তাদের পাল্লায় পড়েছ নাকি? তা যদি প'ড়ে থাক, তা হ'লে তো তুমি তাকে স্বর্গের বিদ্যাধরীই দেখবে। তা স্বচ্ছন্দে দেখ, আমার তাতে একটুও ক্ষতি নাই।

"বৌদিকে তোমার চিঠি শোনাতে, তিনি তো ভেবেই আকুল! বলেন, উপনে নিশ্চয় ডাকিনীর পাল্লায় পড়েছে। ও-বাড়ীর বড়বৌদি অনেক বুঝিয়ে শুঝিয়ে তাঁকে শান্ত করেছেন। বড়বৌদি কালীঘাটে পূজা দেবার জন্যে কা'ল ক'লকাতা যাবেন। আমি তাঁকেই তোমার গাঁটছড়া বাঁধবার ভার দিয়েছি। আর একটা খবর তোমায় দিই। মেনী মর-মর, বোধ হয় দু'পাঁচ দিনের মধ্যেই বেচারী মারা যাবে। তাকে মারলে কে জান? তার মা। তা মরুক পোড়ারমুখী; যে এমন কালো কুচ্ছিত চেহারা নিয়ে জন্মেছে, তার মরাই ভাল কি না, বল দেখি? তুমি না বললেও আমি কিন্তু বলছি, সে মরুক, মরুক, মরুক। তুমি বোধ হয় আমাকে খুব নিষ্ঠুর মনে কচ্চো উপীনদা? তা মনে কর তুমি, তবু আমি তাকে মত্তে হুকুম দিচ্চি। সংসারে ঘৃণা ভিন্ন যার আর কিছু পাওনা নাই, তার মরণে দুঃখ কি? তোমার দুঃখ হচ্চে না কি? তবু ভাল, তোমাদেরও তা হ'লে মেয়েমানুষের—বিশেষ মেনীর মত মেয়ের দুঃখেও দুঃখ হ'তে পারে? 'মাছ মরেছে বেরাল কাঁদে শান্ত করলে বকে।' আমি তোমাকে সান্ত্বনা দিচ্চি উপীনদা, দুঃখ্যু ক'রো না, মেনীর জন্যে চোখের জল ফেলো না। তার জন্যে আমার চোখে তো জল নাই-ই। ইতি— শ্রীমতী গৌরী।"

পাঠ শেষ করিয়া নলিনী পত্রখানা উপেনকে ফিরাইয়া দিল। উপেন জিজ্ঞাসা করিল, "কেমন পড়লে?"

সহাস্যমুখে নলিনী উত্তর দিল, "চমৎকার!"

উপেন বলিল, "মেয়েটা বড় জ্যাঠা। ওর এই রকম জ্যাঠামী আমার আদৌ সহ্য হয় না। এর জন্যে কত দিন আমার হাতে মার খেয়েছে।"

ঈষৎ হাসিয়া নলিনী বলিল, "ভালই হয়েছে। কিন্তু এই মেনী মেয়েটি কে?"

উপে। ও পাড়ার একটা মেয়ে। মেয়েটার বাপ নাই, শুধু মা আছে। দেখতে অতি বিশ্রী।

নলি। এর সঙ্গে বুঝি তোমার বিয়ের কথাবার্ত্তা হয়েছিল?

উপে। কথাবার্ত্তা এমন কিছু হয়-নি। তবে ঐ গৌরী একদিন খেল্‌তে খেল্‌তে দুষ্টুমী ক'রে তার কাপড়ে আমার কাপড়ে গাঁটছড়া বেঁধে দিয়েছিল।

মুখ টিপিয়া হাসিতে হাসিতে নলিনী বলিল, "একেবারে গাঁটছড়া! তা হ'লে তো এক রকম বিয়ে হয়েই গিয়েছে।"

উপেনও ঈষৎ হাসিয়া বলিল, "গাঁটছড়া বেঁধে দিলেই যদি বিয়ে হয়ে যায়, তবে বিয়ে হয়েছে বৈ কি। শুনে তোমার ভয় হচ্চে বুঝি?"

নলি। কিসের ভয়?

উপে। সতীনের!

লজ্জারক্ত মুখে তর্জ্জন করিয়া নলিনী বলিল, "যাও, তুমি বড় দুষ্টু! তোমার সঙ্গে কথা কইবো না।"

উপে। একটিও কথা কইবে না?

নলি। না।

উপে। এই তো একটা কথা কইলে।

নলি। ভুল হয়ে গিয়েছে।

উপে। প্রতিজ্ঞার প্রথমেই যখন এত ভুল, তখন পরে আরও কত ভুল হবে কে জানে?

সলজ্জ হাস্য সহকারে নলিনী বলিল, "বেশী হবে না; হয় তো আর দু'একটা ভুল হ'তে পারে।"

হাসিতে হাসিতে উপেন বলিল, "এখনি তো দু'চারটে হয়ে গেল; যাক্, তোমাকে একটা কথা জিজ্ঞাসা করি নলিনী।"

নলি। কি কথা উপীনদা?

উপে। তুমি কি এখনো আমাকে 'উপীনদা' ব'লে ডাকবে?

নলি। তবে কি ব'লে ডাকবো?

নলিনীর মুখের উপর সহাস্য দৃষ্টি নিক্ষেপ করিয়া উপেন বলিল, "আচ্ছা, আর দু'টো দিন পরে কি ব'লে ডাক, দেখা যাবে।"

নলিনী একটু লজ্জার হাসি হাসিয়া ঘাড় নীচু করিল। উপেন বলিল, "আচ্ছা নলিনী!"

"কি?"

"উপীনদা বল্‌লে না?"

কৃত্রিম কোপে মুখখানাকে গম্ভীর করিয়া নলিনী বলিল, "আমি বলবো না, আমার খুসী।"

মৃদু হাসিয়া উপেন বলিল, "উত্তম, তোমার যখন যা খুসী, তাই ব'লো। এখন জিজ্ঞাসা করি, এ বিয়েতে তুমি কি সুখী হবে?"

মুখ না তুলিয়াই ভারী গলায় নলিনী উত্তর করিল, "কি জানি।"

উপেন বলিল, "কি জানি নয়, বেশ ভেবে চিন্তে দেখ, তুমি কত

লেখা-পড়া জান, :কিন্তু আমি মূর্খ, কুড়ি টাকা মাইনের চাকরী করি। আমি তোমাকে সুখী কত্তে পারবো, মনে কর কি ?"

নলিনী আরক্ত মুখখানা তুলিয়া তর্জ্জন সহকারে বলিল, "তোমার সঙ্গে আমি কথা কইবো না বলেছি, তবে আবার আমাকে এত জিজ্ঞাসা কচ্চো কেন ?"

বলিয়াই নলিনী যেন ঝড়ের মত ঘর হইতে বাহির হইয়া গেল। উপেন মুগ্ধ দৃষ্টিতে তাহার গমনপথের দিকে চাহিয়া-চাহিয়া বিছানার উপর আড় হইয়া পড়িল। আর দুইটা দিন,—দুই দিন পরেই সে এই নারীরত্নকে কণ্ঠে ধারণ করিয়া জীবনটাকে সার্থক করিতে পারিবে। তার পর ? তার পর কি হইবে, না হইবে, এত ভবিষ্যৎ ভাবিয়া সে এমন সুখময় বর্ত্তমানটাকে কিছুতেই উপেক্ষা করিতে পারে না।

বিছানায় আড় হইয়া পড়িয়া উপেন বর্ত্তমানের সুখ-সমুজ্জ্বল চিত্রখানা তন্ময়চিত্তে পর্য্যবেক্ষণ করিতে লাগিল।

সহসা নলিনী ব্যস্তভাবে গৃহমধ্যে প্রবেশ করিয়া বলিল, "তোমাকে কে ডাকচে উপীনদা !"

উপেন তাড়াতাড়ি উঠিয়া বসিয়া জিজ্ঞাসা করিল, "কোথায় ?"

নলিনী বলিল, "রাস্তায় গাড়ীতে ব'সে রয়েচে।"

উপেন উঠিয়া দ্রুতপদে কে ডাকিতেছে দেখিতে চলিল, নলিনী তাহার পশ্চাৎ অনুসরণ করিল।

দরজার বাহিরে গিয়া গাড়ীর দিকে চাহিয়াই উপেন সহর্ষকণ্ঠে বলিয়া উঠিল, "এ কি, বড়দি যে !"

উপেন ছুটিয়া গিয়া গাড়ীর দরজা ধরিয়া দাঁড়াইল। কাদম্বিনী তাহার হাতখানা চাপিয়া ধরিয়া গম্ভীর অনুজ্ঞার স্বরে বলিল, "উঠে আয় !"

উপেন সে আদেশের অন্যথা করিতে পারিল না, কাদম্বিনীর আকর্ষণে আকৃষ্ট হইয়া যন্ত্রচালিতের ন্যায় ধীরে ধীরে গাড়ীর ভিতর উঠিয়া বসিল। কাদম্বিনী গাড়োয়ানকে গাড়ী চালাইতে আদেশ দিল। আদেশপ্রাপ্তিমাত্র গাড়ী ছুটিয়া চলিল। নলিনী নিস্পন্দভাবে দরজার উপর দাঁড়াইয়া দ্রুতগামী গাড়ীখানার দিকে চাহিয়া রহিল।

—২৪—

হাবড়া ষ্টেশনে পৌছিয়া কাদম্বিনী যখন বলিল, "বেশ্যার মেয়েকে বিয়ে ক'রে আমাদের সঙ্গে সম্পর্ক ত্যাগ করবি, না আমাদের সঙ্গে যাবি উপেন ?"

বড়দির প্রশ্নে উপেন শিহরিয়া উঠিল! তাহার মাথার ভিতর যেন ঝিম্ ঝিম্ করিতে লাগিল। কি উত্তর দিবে, স্থির করিতে না পারিয়া সে নীরবে নতমুখে দাঁড়াইয়া রহিল। তাহাকে নীরবে থাকিতে দেখিয়া কাদম্বিনী পুনরায় জিজ্ঞাসা করিল, "চুপ ক'রে রইলি যে ? কি করবি বল্ ? সঙ্গে যাবি ?"

তারপর উত্তর দিবার পূর্ব্বেই নীলমণি অগ্রসর হইয়া বলিল, "তুমি যেমন পাগল, যাবি কি, যেতেই হবে ওকে। এস হে উপেন!"

বলিয়া সে উপেনের হাত ধরিবামাত্র উপেন বিনাপ্রতিবাদে ধীরে ধীরে গাড়ীতে উঠিয়া বসিল এবং যতক্ষণ না গাড়ী ছাড়িল, ততক্ষণ সে গাড়ীর একটি পাশে যেন চোরের মত আড়ষ্টভাবে চুপ করিয়া বসিয়া রহিল। তার পর গাড়ী চলিতে আরম্ভ করিলে সে ব্যস্তভাবে জানালা দিয়া মুখ বাড়াইয়া ব্যাকুল নেত্রে পশ্চাদ্বর্ত্তী সহরের দিকে চাহিল। নলিনী এতক্ষণ কি

করিতেছে, কে জানে! হয় তো সে উদ্‌গ্রীব হইয়া তাহার প্রত্যাগমনপথের দিকে চাহিয়া রহিয়াছে, এবং এখনও তাহাকে ফিরিতে না দেখিয়া ব্যাকুল হইয়া পড়িয়াছে। যতই সময় উত্তীর্ণ হইবে, ততই তাহার ব্যাকুলতা বৃদ্ধি পাইবে। কিন্তু তাহার সে ব্যাকুলতা নিবারণের কোন উপায়ই এখন আর উপেনের হাতে নাই! এখনও নলিনী একবারের জন্যও মনে করে নাই—তাহার বিশ্বস্ত উপীনদা একেবারে অবিশ্বাসী হইয়া, ইঙ্গিতেও একটা কথা না বলিয়া, নিতান্ত পরের মতই চলিয়া গিয়াছে! যখন বুঝিতে পারিবে, তখন সে তাহার উপীনদাকে কতটা নিষ্ঠুর—কতদূর অবিশ্বাসী ভাবিয়া লইবে! শুধু ভাবিয়াই লইবে না, ইহা ভাবিয়া সে কতটা মর্ম্মবেদনা ভোগ করিবে! উপেন কল্পনা-নেত্রে নলিনীর বেদনা-কাতর মুখখানা দেখিতে দেখিতে নিতান্ত চঞ্চল হইয়া উঠিল। তাহার মনে হইল, না, এমনভাবে চলিয়া যাওয়া ঠিক নয়, অন্ততঃ নলিনীকে একটা কথাও বলিয়া আসা দরকার। কথাটা মনে আসিতেই উপেন নিতান্ত চঞ্চলভাবে তাড়াতাড়ি উঠিয়া দাঁড়াইল।

তাহার পার্শে বসিয়া নীলমণি একটা বিড়ি ধরাইয়া তাহাতে মৃদু মৃদু টান দিতেছিল, উপেনকে সহসা উঠিয়া দাঁড়াইতে দেখিয়া সে জিজ্ঞাসা করিল, "কি হে, উঠে দাঁড়ালে যে?"

তাহার কথায় উপেনের যেন চমক হইল। গাড়ী তখন ষ্টেশন ছাড়াইয়া পূর্ণবেগে ছুটিয়া চলিয়াছে। উপেন নিতান্ত হতাশভাবে পুনরায় যথাস্থানে বসিয়া পড়িল। গাড়ী ষ্টেশনের পর ষ্টেশন অতিক্রম করিয়া ছুটিয়া চলিল; উপেন গাড়ীর জানালায় মুখ বাড়াইয়া স্তব্ধ নিস্পন্দভাবে বসিয়া রহিল। তার পর নির্দ্দিষ্ট স্থানে পৌঁছিবার তিনটা

ষ্টেশন আগে গাড়ী থামিলে, সে হঠাৎ গাড়ীর দরজা খুলিয়া নামিয়া পড়িল। গাড়ীর ঝাঁকুনিতে নীলমণির একটু তন্দ্রা আসিয়াছিল; সুতরাং সে কিছুই জানিতে পারিল না।

উপেন হঠাৎ কেন যে নামিয়া পড়িল, কি ভাবিয়া নামিল, তাহা নামিবার পর অনেকক্ষণ পর্য্যন্ত নিজেই ঠিক করিতে পারিল না; অথচ সে গাড়ীতে পুনরায় উঠিবার জন্য কোন চেষ্টাও করিল না। যেন কি একটা প্রবল আকাঙ্ক্ষা আসিয়া তাহাকে পশ্চাৎ হইতে টানিয়া রাখিল। তার পর গাড়ী যখন ছাড়িয়া দিল, তখন সে ধীরে ধীরে গিয়া ষ্টেশনের একপাশে একখানা বেঞ্চির উপর বসিয়া পড়িল, এবং বসিয়া বসিয়া অতঃপর কর্ত্তব্য কি, তাহাই ভাবিতে লাগিল।

অনেকক্ষণ ভাবিবার পর স্থির করিল, আপাততঃ সে কলিকাতাতেই ফিরিয়া যাইবে, এবং নলিনীকে ও নলিনীর মাকে বুঝাইয়া বলিয়া পুনরায় বাড়ী ফিরিবে। সঙ্কল্প স্থির করিয়া উপেন উঠিয়া দাঁড়াইল। এমন সময় ডাউন ট্রেণ আসিবার ঘণ্টা পড়িল। উপেন তাড়াতাড়ি টিকিট কিনিতে চলিল। কিন্তু পকেটে হাত দিয়াই সে চমকিয়া উঠিল। সর্ব্বনাশ, পকেটে যে সাতটি মাত্র পয়সা রহিয়াছে! উপেন জিজ্ঞাসা করিয়া জানিল, এখান হইতে হাবড়ার ভাড়া সাড়ে পাঁচ আনা। শুনিয়া তাহার কলিকাতা যাইবার আশা তিরোহিত হইল। এখন দেশে যাওয়া ছাড়া আর উপায় নাই। কিন্তু দেশে যাইবারই বা উপায় কি? এখান হইতে চিলেডাঙ্গা ষ্টেশনের ভাড়াও যে তেরো পয়সা। ছয় পয়সার অভাব। তুচ্ছ ছয়টা পয়সা হইলেও—এখন সেই ছয়টা পয়সাই বা পায় কোথায়? উপেন নিতান্ত ব্যাকুলভাবে গায়ের জামাটার দিকে চাহিল। কিন্তু যে সার্টখানায় রূপার বোতাম লাগান ছিল, এটা তো সে জামা নয়, এ যে মোটা পাঞ্জাবীটা।

হাঁটিয়া গেলেও সাত ক্রোশ রাস্তা হাঁটিতে হইবে। সাত ক্রোশ রাস্তা হাঁটিয়া যাইবার শক্তি থাকিলেও বেলা তখন বেশী ছিল না; যেটুকু বেলা আছে, তাহাতে ক্রোশ দুই রাস্তা না যাইতেই সন্ধ্যা হইয়া আসিবে। উপেন নিতান্ত হতাশচিত্তে ফিরিয়া গিয়া পুনরায় বেঞ্চিখানার উপর বসিয়া পড়িল, এবং বসিয়া বসিয়া নিজে এরূপে নিজের বিপদ ডাকিয়া আনিবার জন্য আপনার বুদ্ধিকে ধিক্কার দিতে লাগিল।

কিন্তু যাহা হইয়া গিয়াছে, তাহার আর চারা নাই; এখন যাহা হয় একটা উপায় করিতেই হইবে, এমন নিরুপায়ভাবে বসিয়া থাকিলে চলিবেনা। ভাল, ষ্টেশন-মাষ্টারের কাছে গিয়া নিজের বিপন্ন অবস্থার কথা খুলিয়া বলিলে তিনি কি একটা উপায় করিয়া দিতে পারিবেন না? ষ্টেশনে যে বাবুরা আছে, প্রত্যেকে একটা করিয়া পয়সা দিলে অনায়াসেই তাহার টিকিটের পয়সা কুলাইয়া যাইবে। উপেনের মনে পড়িল, যাত্রার দলে থাকিবার সময় একবার সে এইরূপ বিপদে পড়িয়াছিল। দলের সঙ্গে ট্রেণে যাইতে যাইতে একটা ষ্টেশনে সে জল খাইতে নামিলে গাড়ী ছাড়িয়া দেয়; তখন সে কাঁদাকাটা করায় ষ্টেশনের বাবুরা দয়া করিয়া তাহাকে দশ আনার টিকিট কিনিয়া দিয়াছিল। এবারে কি আর ছয়টা পয়সা দিবে না?

ষ্টেশন-মাষ্টারের কাছে যাইবার জন্য উপেন উঠিল বটে, কিন্তু সহসা যাইতে পারিল না; কেমন যেন একটা লজ্জায় তাহার পা দুইটা জড়াইয়া যাইতে লাগিল। উপেন দেখিল, এখন আর সে সেই যাত্রার দলের উপেন নয়; সে উপেনের সঙ্গে তাহার এখন অনেক পার্থক্য জন্মিয়াছে। এখন হাজার বিপদে পড়িলেও লোকের কাছে গিয়া পয়সা ভিক্ষা করিবার মত সঙ্কোচহীনতা আর নাই। অথচ ভিক্ষা না

করিলেও উপায় নাই। উপেন নিতান্ত ব্যাকুলভাবে ইতস্ততঃ করিতে লাগিল।

এমন সময় বরসহ এক দল বরযাত্রী আসিয়া ষ্টেশনে প্রবেশ করিলে, ষ্টেশনের যাবতীয় লোক গিয়া বরকে ঘেরিয়া দাঁড়াইল। উপেনও কৌতূহলী হইয়া তথায় উপস্থিত হইল, এবং বর দেখিয়া ক্ষোভে বিস্ময়ে সে নিজের চিন্তা আপাততঃ বিস্মৃত হইল। ষাইট বছরের বুড়া, দাঁতের চিহ্নমাত্র নাই, মাথার চুল সাদা হইয়া গিয়াছে, গাত্রচর্ম্ম লোল, জরাভারে দেহটি বাঁকিয়া পড়িয়াছে। সেই জরাবঙ্কিম দেহখানা পট্টবস্ত্রে আবৃত করিয়া বুড়া কোন্ মুখে কোন্ আশায় বিবাহ করিতে চলিয়াছে, বরের দিকে চাহিয়া চাহিয়া উপেন তাহাই ভাবিতে লাগিল।

বরের উপর রাগ হইলেও যখন সে জানিতে পারিল যে, ইহারা চিলেডাঙ্গা ষ্টেশনে গিয়া নামিবে, তখন সে আপাততঃ রাগটাকে দূরে রাখিয়া, বরযাত্রীদের সঙ্গে মিশিয়া গাড়ীতে উঠিয়া পড়িল।

কিন্তু গাড়ীতে উঠিয়াই বা নিস্তার কোথায়! ও লোকটা আবার কোথা হইতে আসিল—ঐ দারোগা? মাথার টুপীতে চাপরাশ-আঁটা, সাহেবের পোষাক-পরা রেলের দারোগাবাবু, 'টিকিট, টিকিট' শব্দ করিতে করিতে পায়ে-প্যায়ে ক্রমশঃ তাহার দিকেই যে অগ্রসর হইয়া আসিতেছে! এখন উপায়? দারোগা ত ছাড়িবার পাত্র নহে; এখনই আসিয়া উপেনের নিকট টিকিট চাহিবে, দেখাইতে না পারিলেই এতগুলা ভদ্রলোকের সমক্ষে যথেচ্ছা অপমান করিবে। সে অপমান সহ্য করা তাহার একেবারেই অসাধ্য। উপেনের ইচ্ছা হইল, চলন্ত গাড়ীখানা হইতে তখনই লাফাইয়া পড়ে। কিন্তু ইচ্ছা হইলে কি হইবে, জানালা দিয়া মুখ বাড়াইতেই তাহার হৃৎকম্প হইল। হাওয়া ফাঁড়িয়া রেল ছুটিতেছে—সোঁ সোঁ সোঁ! অতি ভয়ে জানালা

হইতে মুখ ফিরাইতেই কি সর্ব্বনাশ! উপেনের নাসিকাগ্রভাগে ডানহাতখানার তর্জ্জনী রাখিয়া রেল-দারোগাবাবু বজ্রগম্ভীর স্বরে হাঁকিতেছে, "টিকিট, টিকিট?"

উপেনের মুখখানায় সহসা কে যেন কালি ঢালিয়া দিল। ভীতিবিহ্বল নেত্রে একবার চেকার সাহেবের মুখের দিকে চাহিয়াই পাঞ্জাবীটার পকেটে হাত দিয়া কি বলিতে যাইবে, এমন সময় গাড়ীর ভিতর একটা সোরগোল উঠিল, "বাতাস কর, বাতাস কর" (খক্ খক্ খক্) "শুয়ে পড় ঘোষজা মশায়, এখনই সেরে যাবে" (খক্ খক্) "ব্যাগত্তা করি ঘোষজা মশায়, শুয়ে পড়, শুয়ে পড়"—"শুতে (খক্ খক্) পা—চ্ছি—নি—(খক্ খক্)—যে—রেঃ খক্ খক্ খক্—" পিছনের বেঞ্চি হইতে কে একজন বলিয়া উঠিল, "যাঃ, কাস্‌তে কাস্‌তে লোকটা বুঝি দম্ আট্‌কে ম'রে গেল রে!"

এবার উপেন মুখ তুলিয়া চাহিল, তখন রেলের চাকার নিকট আর্ত্তনাদের পরিবর্ত্তে মানুষের কণ্ঠের 'নেয়াপাতি ডাবের জল—পান, বিড়ি, সিগারেট' শব্দের সঙ্গে গাড়ীর ভিতরের বহু কণ্ঠোচ্চারিত হট্টগোলের ভয়ে সারা গাড়ীখানি একেবারে নিথর দাঁড়াইয়া গিয়াছে, সেই ফাঁকে টিকিটমাষ্টার-রেলদারোগাবাবুটিও বেমালুম অন্তর্হিত হইয়াছে।

'কে বলে মা কালী নাই—আঃ' বলিয়া পাঞ্জাবীর পকেট হইতে একটি পয়সা বাহির করিয়া একবার কপালে ঠেকাইয়া উপেন কোঁচার খুঁটে সেটিকে সযত্নে বাঁধিয়া রাখিল, বুঝি চালকের হাতের কানমলা খাইয়া দণ্ডায়মান রেলগাড়ীখানা নিষ্ফল গর্জ্জন করিতে করিতে পুনরায় ছুটিল।

স্বস্তির নিশ্বাস ফেলিয়া হাস্য-প্রফুল্ল-কণ্ঠে উপেন যাহাকে জিজ্ঞাসা

করিল, "এখান থেকে চিলেডাঙ্গা যেতে আর ক'টা ইষ্টিশান আছে মশায় ?"—সে একজন বরযাত্রী। এ সব কথার জবাব দিবার মত অবসর তখন তাহার না থাকিলেও "চিলেডাঙ্গা" নাম শুনিয়া ব্যগ্রকণ্ঠে লোকটি উত্তর করিল, "মাঝে একটা, তার পরেই চিলেডাঙ্গা"। কোথায় যাবে তুমি ?"

"ঐ চিলেডাঙ্গা।"

"চিলেডাঙ্গা। কোন্ পাড়া ?"

"বোসপাড়া।"

"তোমরা ?"

"কায়স্থ।"

উপেনের জাতি-পরিচয় ও বোসপপাড়া-নিবাসী শুনিয়া সহযাত্রীদিগের প্রতি অঙ্গুলি নির্দ্দেশ করিয়া হর্ষোৎফুল্ল-কণ্ঠে লোকটি বলিয়া উঠিল, "থাম হে, সব চুপ কর, গোল ক'রো না, এই দেখ, বুড়ো শিব কেমন জুটিয়ে দিয়েচেন। সকলই বাবা বুড়োশিবের ইচ্ছা। বুড়ো শিবের দয়া না থাকলে লোকে এক দণ্ড বাঁচতো! ক'নে রইলো গাঁয়ে, আর বর এই রেলগাড়ীতে। কে জান্তো, বিয়ে কত্তে যাবার পথে বরের হাঁপানীর টান এমন বেড়ে উঠবে।। আর তাও বলি বাপু, জান যে, রাত ন'টায় লগ্ন! তোমরাই বা অমন হাঁপ-কাসির রুগীকে ঘন ঘন তামাক সেজে কোন্ সাহসে দিলে! যাক্, সকলই বুড়ো শিব বাবা ভোলা মহেশ্বরের খেলা। দেখ না, যেমনি হাঁপের টানটি বেশী হওয়া, অমনি ক'নের বাড়ী থেকে খবর নিতে কেমন লোকটি এসে হাজির!"

সহযাত্রীটির কথায় বরযাত্রীর দল সকলেই উৎসুক নয়নে উপেনের দিকে চাহিল।

উপেন বিস্ময়চমকিত দৃষ্টিতে গাড়ীস্থ সকলের মুখের দিকে চাহিয়া আশ্চর্য্যের সুরে বলিয়া উঠিল, "ক'নের বাড়ী থেকে? কোথাকার ক'নে!"

ভ্রূভঙ্গী সহকারে পূর্ব্বব্যক্তিটি বলিয়া উঠিল, "পরেশ মিত্তিরের মেয়ে গো মশায়। এক গাঁয়ে বাস, ক'নের বাপকে চেনো না, কেমন ধারা লোক তুমি? তবে হ্যাঁ, বলতে পারো, তিনি বহুদিন পূর্ব্বে গঙ্গালাভ করেছেন। তা যিনি যাবেন, তাঁকে আর কে ধ'রে রাখবে বলুন। ভাল কথা, তুমি চিলেডাঙ্গার দয়ারাম ঘোষকে চেনো? আহা, বড় সজ্জন ব্যক্তি। কেবল তাঁর খাতিরেই অমন বাপ-খেকো কালো কুচ্ছিত মেয়ের সঙ্গে বিয়ে দেওয়া, নইলে মধুসূদন ঘোষের এখনও যা নামডাক আর কড়ি আছে, তাতে আসল ছেড়ে কেবল সুদ, সুদ—সুদের কড়ির অদ্দেক অংশ মাপ করলে কত খাতক মেয়ে মাথায় করে এনে এই 'কুমীরে-বুড়োর' সঙ্গে মালা বদল করিয়ে হাস্‌তে হাস্‌তে মেয়ে-জামাই ঘরে তুলবে। বুড়ো বয়সে অমন সবারই এক আধটু সর্দ্দি-কাসি হ'য়ে থাকে। তা দেখ, ক'নের দলের লোক, তুমি ভেবো না, আর তাদেরও ভাবতে বারণ ক'রে দাও গে। ইষ্টিশানে পাল্কীর বন্দোবস্ত করেছ ত? তুমি এগিয়ে দাদা খবরটা দাও গে, আমরা সঙ্গে সঙ্গেই গিয়ে পড়চি। আর দেখ, আমাদের জন্যে ভেবো না। ও বুড়ো শিবের দয়ায় একটু রাত বেশী হলেও আমাদের ক্ষেতি নাই। ও কাজে বাড়ীর খাওয়া-দাওয়ায় বিলম্ব একটু হয় বৈ কি। আমরা তেমন লোক নই, পরে বুঝবে।" তার পর সহযাত্রীদের দিকে চাহিয়া "ওহে, রংমশালগুলো নিতে যেন ভুল না হয়, টোপর ফুলমালা সাবধান। আহা-হা, অমন হেঁচকা দিয়ে টেনো না, হাজার হোক্ বয়েস ত হয়েচে, তার উপর সর্দ্দির ভাবটাও একটু জানান দিয়েচে। গাড়ী একেবারে

না থামলে 'আঁকু-পাঁকু' ক'রে কেউ নামবে না। টিকিস্‌গুলো সব আমার হাতে দিয়ে দাও, জয় বুড়ো শিবের জয়!"

মন্ত্রমুগ্ধের মত উপেন এতক্ষণ কেবল লোকটির মুখের দিকে হাঁ করিয়া চাহিয়াছিল। তারপর গাড়ী ছাড়িবার ঘণ্টা শুনিয়াই তাড়াতাড়ি গাড়ী হইতে লাফাইয়া পড়িল এবং দু'হাতে মাথাটা টিপিয়া ধরিয়া টিকিট-ঘরের পার্শ্বস্থিত খালি বেঞ্চখানার উপর অবসন্নভাবে শুইয়া পড়িল। এ ক'নেটা তা' হ'লে কে? বাপ-খেকো মেয়ে, আবার কালো কুচ্ছিত, তার উপর আর না কাহার নাম করিল, হাঁ, সেই নামই ত বটে। দয়ারাম ঘোষ! উপেন ক্ষিপ্তের মত চীৎকার করিয়া উঠিল। মিথ্যা কথা। তা কখনও হইতে পারে না। ওই ঢক্‌ঢকে বুড়ো, ও ত বৈতরণীর খেয়া-পারের যাত্রী! মেনি! মেনি! তোর কপালে কি বিধাতা বিয়ের রাতেই বিধবা হবার কথা লিখে দিয়েছিল! ভগবান্, মেনীকে বাঁচাও! কথাটা মনে উঠিতেই উপেন চমকিয়া উঠিল। না, না, মেনী মরুক্। গৌরী ত লিখিয়াছে, 'মেনী মর-মর, দু'পাঁচ দিনের মধ্যেই বেচারী মরিয়া যাইবে।' তা মরুক্ সে। কে সে আমার? মনে মনে এইরূপ তোলাপাড়া হইতে থাকিলেও মেনীকে একেবারে কেউ নয় বলিয়া মন হইতে উপড়িয়া ফেলিতে উপেনের সাহসে কুলাইল না। মেনী কেউ না হইলেও একটা কেউ না-কেউ বটে। তার উপর সেই দুষ্টু মেয়ে গৌরীটার সেই ছেলেবেলার গাঁটছড়া বাঁধিয়া দেওয়ার কথাটা কেমন ঘুরিয়া ফিরিয়া মনের ভিতর কসিয়া কসিয়া আরও বসিয়া যাইতে লাগিল। হউক মেনী কুরূপ কুৎসিত, তবুও তার সেই ব্যথাভরা সজল চক্ষু দু'টার চাহনি, উপেনের চক্ষুর সম্মুখে আজ সে দিনের মতই ভাসিয়া বেড়াইতে লাগিল। না, সে একবার যাইবে, মেনীর মৃত্যু-মলিন মুখখানা সে একবার জন্মের মত

শেষ দেখিয়া লইবে, সঙ্গে সঙ্গে মেনীর ডঙ্কা বাজাইয়া চলিয়া যাওয়ার কথাটা গৌরীকে ভাল করিয়া বুঝাইয়া বলিয়া আসিবে. দুষ্ট মেয়ে, দেখলি, তোর উপীন-দা হটবার পাত্র নয়, কেমন মজায় মজায় বাজীটা মাৎ হয়ে গেল! এখন তোর মতন দশটা টুকটুকে গৌরী এলে তোর উপীন-দা তোকে গ্রাহ্যও করবে না। মেনী চলিয়া যাইতে বসিয়াছে, গৌরীও এখন তাহার মন হইতে অনেক দূরে সরিয়া দাঁড়াইয়াছে, এখন তোর উপীন-দার জীবনের ধ্রুবতারা কে জানিস?—নলিনী! আগে নলিনীর সঙ্গে বিবাহটা একবার হইয়া যাক্, তার পর তোর রূপের বড়াই ভাঙ্গিয়া দিব। তা ত দিব। কিন্তু ঐ যে ঘাটের মড়াটা বিবাহ করিতে চলিয়াছে, কাহাকে থান কাপড় পরাইবার জন্য উহার শুভাগমন, সেটাও ত একবার জানা দরকার। বরযাত্রীটা যেরূপ পরিচয় দিল, তাহাতে উহাকে মেনীর বর বলিয়াই বিবেচনা হয়। কিন্তু গৌরী তবে ওরূপ পত্র লিখিল কেন? না, ব্যাপারটা ভাল করিয়া বুঝা দরকার হইয়া পড়িয়াছে। উপেন উঠিয়া বসিল, কৈ, বর, বরযাত্রী কেহই ত ইষ্টিশানে নাই! 'শিবরাত্রির সলিতার' মত লণ্ঠনের ভিতর যে একটি আলো মিট্ মিট্ করিয়া জ্বলিতেছিল, সেটাও কোন্ ফাঁকে নিভিয়া গিয়াছে। উপেন উঠিয়া দাঁড়াইল, তার পর ষ্টেশনের বাহিরে মেঠো রাস্তা ধরিয়া পায়ে পায়ে বরাবর গ্রামাভিমুখে অগ্রসর হইল।

কিছুক্ষণ হাঁটিবার পর আলোক-অন্ধকার-মিশ্রিত রসুলপুরের বাজারের সীমানাটা উপেনের দৃষ্টিপথে আসিতেই বেসুরে বেলয়ে গান হাঁকিল,—

"এলো তোর প্রাণ-বঁধূ এলো।
টেনেছ প্রেমের ডুরী লুকিয়ে কোথা থাকবে বলো।"

কিন্তু তান রেখাব হইতে মধ্যমে উঠিবার পূর্ব্বেই একজন আরও বেতালা বৃদ্ধ লোক আসিয়া গানের প্রথম মওড়ার জমাটি ভঙ্গ করিয়া হাঁপাইতে হাঁপাইতে বলিল, "এখানে কবরেজের ঘর কোথা বলতে পারো মশাই ?"

"দ্যাৎ তোর কবরেজ, গানটা মাটী ক'রে দিলেন মশায়! এই অন্ধকার মাঠে কি কবরেজ ব'সে থাকে, ঐ সামনে বাজার দেখছেন, ঐখানে একটা কবরেজের গুলীর আড্ডা আছে, গোল গোল গুলী, খেতে না খেতেই দাস্ত পরিষ্কার হয়ে যাবে, যান।"

গভীর বিস্ময়ে আগন্তুক বলিল, "দাস্ত কি মশাই, সর্দ্দি-গর্ম্মী; অনেকটা পথ হেঁটে রসুলপুরের বাজারে এসে দাদা মশাই আমার গলদ্‌ঘর্ম্ম লেগে হাঁপিয়ে পড়েছে, তাই একটু রসসিন্দূরের খোঁজ-তল্লাস কচ্চি, বলি কাছে-পিঠে যদি কেউ কবরেজ থাকে, যদি একটু জোগাড় কত্তে পারি।"

তাহার কথা শুনিয়া উপেন সোল্লাসে হাসিয়া উঠিল। এ বুড়োটাই কতজনার দাদা মশাই, এর আবার দাদা মশাই, অসুখ আবার তার সর্দ্দি-গর্ম্মী। তা ওষুধের ব্যবস্থাটাও হইয়াছে ভাল। তার পর সেই বৃদ্ধের দিকে চাহিয়া বিদ্রূপ-তরল কণ্ঠে বলিল, "ওষুধ আর বোধ হয় দরকার হবে না। কারণ, তিনি নিজেই এখন রসসিন্দূর হয়ে দাঁড়িয়েছেন। নিদানসময়ে শ্লেষ্মা-ধাত গরম করবার জন্যে লোকে ঐ ওষুধটা খাইয়ে থাকে। তা আপনার দাদা মশাইএর যখন শ্লেষ্মা, গরম দু'টাই একসঙ্গে দেখা দিয়েছে, তখন তিনিই স্বয়ং মকরধ্বজ; আর আপনাদের মত ছোট ছোট নাতিপুতির দল তাঁর পা-ধোয়া জল খেলে বিষে বিষক্ষয় হয়ে তিনিও বেঁচে যাবেন, আর আপনাদেরও বাড়-বাড়ন্ত হবে, অক্ষয় অমর হয়ে আপনারা চারযুগ এই পৃথিবীতে থাকবেন।"

বিরক্তিকুঞ্চিত মুখে বৃদ্ধ বলিল, "তামাসা কচ্ছো মশাই! এ তামাসার কথা নয়, গাঁ সম্পর্কে তিনি আমাদের দাদা মশাই হন, এ কথা গাঁ-শুদ্ধ লোক সবাই জানে।" বলিয়া যে পথ হইতে আসিয়াছিল সেই বাজারের পথেই পুনঃ প্রত্যাবর্ত্তন করিল। আর অপয়া গানটায় বাধা পাইয়া উপেন তাহার পুরাণো সাধা গান হাঁকিতে হাঁকিতে চলিল,—

"তোরা যাসনে যমুনাকূলে সই লো, ফিরিয়ে আয়।"

—২৫—

দয়ারাম বলিল, "উপেনের ব্যাপার শুনেছ কুসুম?"

গম্ভীর মুখে কুসুম উত্তর করিল, "বেউশ্যের মেয়েটাকে বিয়ে করেছে তো?"

দয়ারাম বলিল, "হাঁ, বিয়ে ক'রে বৌ নিয়ে সে আসছে, তুমি বরণডালা সাজিয়ে রাখ।"

ক্রোধসূচক ভ্রূভঙ্গী করিয়া কুসুম বলিল, "বোয়ে গিয়েছে আমার বরণডালা সাজাতে। যার বেশী মাথাব্যথা, সেই বরণডালা সাজাবে।"

ঈষৎ হাসিয়া দয়ারাম বলিল, "তুমি তার দিদি, তোমার চেয়ে কার মাথাব্যথা বেশী হবে?"

ভারীমুখে কুসুম বলিল, "আমি তার দিদি বলেই আমাকে এত কথা শোনাচ্ছো, এত টিট্‌কারী দিচ্ছো, না?"

অভিমানের আবেগে কুসুমের চোখ দুইটা জলে ভরিয়া আসিল। তদ্দর্শনে দয়ারাম বলিল, "সর্ব্বনাশ, তুমি কেঁদে ফেললে যে ছোট বৌ!"

অশ্রুগদ্‌গদ কণ্ঠে কুসুম বলিল, "আমার ভাই সে, তাই আমার কান্না

আসচে। তোমার ভাই যদি এই রকম কত্তো, তবে তোমারো কান্না আসতো কি না দেখে নিতাম।”

কুসুমের চোখ দিয়া টপ্ টপ্ অশ্রুবিন্দু গড়াইয়া পড়িল। দয়ারাম তাহার মর্ম্মবেদনা হৃদয়ঙ্গম করিয়া একটু লজ্জিত হইল ; বলিল, “তোমাকে কাঁদতে হবে না, বিয়ে হয় নি এখনো, আমি রহস্য কচ্ছিলাম।”

আঁচলে চোখ মুছিয়া কুসুম বলিল, “তোমার কোন্‌টা রহস্য, কোন্‌টা সত্যি, বোঝা দায়।”

দয়ারাম বলিল, ”দায় হ’লেও বিয়ে যে হয়নি, এটা সত্যি কথা।”

কুসু। তুমি খবর পেলে কোথা থেকে ?

দয়া। নীলমণি-দা আর বড় বৌ ক’লকাতা গিয়েছিল না ? তারা এইমাত্র ফিরে এসেছে।

কুসু। তাদের সঙ্গে দেখা হয়েছে ?

দয়া। দেখা হওয়া ছেড়ে বড় বৌ তাকে সঙ্গে ক’রে নিয়ে আসছিল, গাড়ীতেও উঠেছিল ; তার পর রাস্তার মাঝে কোথায় গাড়ী থেকে নেমে পালিয়েছে।

একটু উদ্বেগের সহিত কুসুম জিজ্ঞাসা করিল, “নেমে পালিয়ে গেল কেন ?”

দয়ারাম বলিল, “বোধ হয় লজ্জায়। ঐ যে বেউশ্যের মেয়েকে বিয়ে কত্তে চেয়েছিল না ?”

কুসু। কিন্তু নেমে গেল কোথায় ?

দয়া। তা তো ওরা বলতে পারলে না। নেমে কলকাতায় ফিরে যেতে পারে, দেশেও আসতে পারে।

কুসু। দেশে এলে ওদের সঙ্গেই আসতো। তা হ’লে ক’লকাতাতেই ফিরে গিয়েছে।

একটু ভাবিয়া দয়ারাম বলিল, "তাই সম্ভব।"

উদ্বিগ্নভাবে কুসুম বলিল, "তা হ'লে রাস্তা থেকে যখন ফিরে গিয়েছে তখন এবার নিশ্চয়ই বিয়ে করবে।"

দয়ারাম বলিল, "আমারও সেই রকমই মনে হচ্চে। বড়বোয়ের ধরাবাঁধায় মুখ এড়াতে না পেরে সঙ্গে এসেছিল। কিন্তু তাদের মায়া ভুল্‌তে না পেরে চুপে চুপে নেমে পালিয়েছে। বেশ্যার মায়া, ডাকিনীর মায়া, ওরা যে সাক্ষাৎ ডাকিনী।"

কুসুম বলিল, "এখন ডাকিনীদের হাত থেকে তাকে উদ্ধার কর্‌বার উপায় কি?"

চিন্তিতভাবে দয়ারাম বলিল, "দেখছি, নিজে একবার না গেলে উপায় হবে না।"

ব্যস্ততার সহিত কুসুম জিজ্ঞাসা করিল, "যাবে তুমি?"

দয়ারাম বলিল, "যেতে পারি, কিন্তু আজকাল দু'টো দিন তো নয়। আজ মেনীর বিয়ে।"

কুসুম বলিল, "মেনীর বিয়ে, তাতে তোমার কি?"

কুসুমের কথায় বিস্ময় প্রকাশ করিয়া দয়ারাম বলিল, "ক'ও কথা, আমিই এ বিয়ের ঘটক। শুধু ঘটক কেন, কন্যাকর্ত্তা বরকর্ত্তা দুই। আমি না থাকলে চলে?"

রাগতভাবে কুসুম বলিল, "তা তো চলে না, কিন্তু আজ যদি সে বিয়ে ক'রে ফেলে, তুমি কা'ল গিয়ে কি করবে?"

দয়ারাম তাহাকে শান্ত করিবার অভিপ্রায়ে বলিল, "না না, আজই বিয়ে করবে, এমনই কি কথা আছে? আজ সাড়ে পাঁচটার গাড়ীতে ফিরে গেলেও ক'লকাতায় পৌঁছুতে তার রাত আটটা বেজে যাবে। আজ কি আর বিয়ে হ'তে পারে?"

রাগে ঘাড় দোলাইয়া কুসুম বলিল, "তুমি ঘরে ব'সে খড়ি পেতে বলছো হ'তে পারে না, কিন্তু হয়ে গেলে কি করবে ?"

চিন্তিতভাবে মাথা নাড়িয়া দয়ারাম বলিল, "কি আর করবো। তবে বিয়ে হোক্ আর নাই হোক্, আজ তো আমি কিছুতেই যেতে পারি না।"

গম্ভীরমুখে কুসুম বলিল, "যেতে যে পারবে না, তা আমি বেশ জানি।"

দয়া। কিসে জান্‌লে ?

কুসু। সে তোমার মা'র পেটের ভাই নয়।

দয়া। মা'র পেটের ভাই হ'লেই কি আজ যেতাম মনে কর ?

কুসু। হাজার কাজ ফেলে ছুটে যেতে।

কুসুমের স্বরটা অভিমানে গাঢ় হইয়া আসিল। দেখিয়া দয়ারাম ঈষৎ হাসিয়া বলিল, "মা'র পেটের ভায়ের ওপর তোমার যে এতটা দরদ আছে, এটা দেখেও সুখী হলাম ছোটবৌ। কিন্তু এই দরদটুকু যদি আগে দেখাতে ? যদি আমার ভাত খাওয়ায় তার অপমান নাই বুঝে তাকে বাড়ী-ছাড়া না কত্তে ?"

আপনার ভুল বুঝিতে পারিয়া ঈষৎ লজ্জিতভাবে কুসুম বলিল, "তখন কি জানি, হতভাগা চাকরী কত্তে গিয়ে এই কাণ্ড বাধিয়ে বসবে ?"

দয়ারাম বলিল, "এটা তো খুব ছোটখাট কাণ্ড। এর চেয়েও গুরুতর কাণ্ড যে বাধিয়ে বসে নাই, তাই যথেষ্ট। ক'লকাতা সহর, প্রলোভনের জায়গা ; সেখানে ওর মত ছোকরাদের একা ছেড়ে দিতে আছে ?"

স্বামীর উক্তির যাথার্থ্য হৃদয়ঙ্গম করিয়া কুসুম বলিল, "যা হবার

হয়ে গিয়েছে, এখন ফিরিয়ে এনে তুমি তার বিয়ে দাও, যা ইচ্ছা কর, আমি আর কোন কথাই কইবো না।"

দয়া। কইবে না?

কুসু। না।

দয়া। যদি মেনীর মত মেয়ের সঙ্গে বিয়ে হয়?

কুসু। মেঠো পেত্নীর সঙ্গে বিয়ে হ'লেও আমার আপত্তি নাই।

দুঃখে নৈরাশ্যে দয়ারামের ভ্রূযুগল কুঞ্চিত হইল। হায়, কুসুম যদি আগে এতটা বুঝিত, তাহা হইলে মেনীর মায়ের প্রতিশ্রুত সাত শো টাকা কি হাতছাড়া হয়? অদৃষ্ট! দয়ারাম তখন পত্নীকে সান্ত্বনা দিয়া বলিল, "তোমার কোন চিন্তা নাই ছোটবৌ, বিয়ে না হ'তেই আমি তাকে ফিরিয়ে আনবো। কিন্তু আজ যদি বড়বৌয়ের সঙ্গে হতভাগা এসে পড়তো।"

কুসুম জিজ্ঞাসা করিল, "এসে পড়লে কি হ'তো?

দয়া। তা হ'লে আজ এই লগ্নেই মেনীর সঙ্গে তার বিয়ে লাগিয়ে দিতাম।

কুসু। আর যে বর বিয়ে কত্তে আসতো?

দয়া। সে হাতে সুতো বেঁধে শিশুপালের মত ফিরে যেতো।

দয়ারাম হা হা করিয়া হাসিয়া উঠিল। কুসুম হাসিতে হাসিতে বলিল, "তা হ'লে তোমার ঘটকবিদায়টাও সে ভাল রকমে দিয়ে যেতো।"

দয়ারাম বলিল, "মন্দ রকম হ'লেও সে ক্ষতিটা তোমার কাছে পূরণ ক'রে নিতে পারতাম।"

সহাস্যমুখে কুসুম বলিল, "তা পারতে বৈ কি। তোমার মত ঘটককে আমি ভাল রকমই বিদায় দিতে জানি।"

দয়ারাম বলিল, "তুমি দিতে না জানলেও আমি আদায় ক'রে নিতে জানি।"

ঠোঁট ফুলাইয়া কুসুম বলিল, "আচ্ছা, খুব বাহাদুর তুমি। এখন উপ্‌নেকে ফিরিয়ে নিয়ে এস দেখি, তবে তোমার বাহাদুরী বুঝবো।"

বলিয়া কুসুম সবেগে মুখটা ঘুরাইয়া লইল। দয়ারাম হাসিতে হাসিতে উঠিয়া বিবাহ বাড়ীর দিকে রওনা হইল।



"আয় মেনী, তোকে সাজিয়ে দিই।"

বিবাহবাড়ীতে উৎসবের সাড়াশব্দ ছিল না, কুটুম্বকুটুম্বিনীগণের আনন্দকল্লোলে গৃহ মুখরিত হইতেছিল না, কটাহবিক্ষিপ্ত ঘৃতের মিষ্ট গন্ধে আকৃষ্ট হইয়া প্রতিবেশিগণ মধুগন্ধলুব্ধ মধুকরের ন্যায় ইতস্ততঃ ঘুরিয়া বেড়াইতেছিল না। কেবল পাড়ার দুই চারিটি মেয়ে—বুড়ো বর দেখিয়া কৌতুকপ্রবৃত্তি চরিতার্থ করিবার আশায় অযাচিতভাবে বিবাহবাটীতে উপস্থিত হইয়াছিল, এবং নিস্তারিণী কর্ত্তৃক অনুরুদ্ধ না হইলেও বিবাহের আয়োজনে ব্যস্ত হইয়া পড়িয়াছিল। সঙ্গে সঙ্গে নিস্তারিণী কর্ত্তৃক কষ্টে আহৃত জিনিষপত্র দেখিয়া নাসিকাকুঞ্চনে নিস্তারিণীকে ব্যতিব্যস্ত করিয়া তুলিয়াছিল। "ও মা, গড়ে-মালা দুছড়া আর পাওয়া গেল না? বরের এ কি জোড়? আজকাল বাগ্দীদের ঘরেও বরকে এর চেয়ে যে ভাল কাপড় দেয়। পাঁচ আনা দামের টোপর—তা পাকা চুলে পরিবার উপযুক্ত টোপর বটে; বরের জল-খাবার এখানে না পাওয়া যায়, নতুন গঞ্জের বাজার হইতে আনাইলেও তো চলিত, দন্তহীন বর শুধু মেড়ের জোরে এ চিনির ডেলা ভাঙ্গিতে পারিবে কেন? হোক্ না কালো মেয়ে, চার গণ্ডা পয়সার পাউডার

আনাইলে আজ রাত্রে কে উহাকে কালো বলিয়া ধরিতে পারিত ?” প্রতিবেশিনীদিগের এইরূপ উপহাসপূর্ণ তীব্র মন্তব্যগুলা নিস্তারিণীর বুকে শেলের মত বিদ্ধ হইলেও নিস্তারিণী সহাস্যমুখেই যাহাতে কোনরূপে চার হাত এক হয়, তাহারই উপায় করিবার জন্য সকাতরে সকলকে অনুরোধ করিতেছিলেন। মেনী একপাশে চুপ করিয়া বসিয়া মাতার এই লাঞ্ছনা প্রত্যক্ষ করিতে করিতে ক্ষোভে দুঃখে মর্ম্মে মর্ম্মে দগ্ধ হইতেছিল।

গৌরী পাড়ার মেয়ে। সেও মেনীর বুড়া বর দেখিয়া কৌতুক উপভোগ করিবার লোভ সংবরণ করিতে পারে নাই। সুতরাং অন্যান্য রমণীদের সঙ্গে গৌরীও উপস্থিত হইয়াছিল। সে কিন্তু কোনরূপ মন্তব্য প্রকাশ করিতে পারে নাই, শুধু নিষ্কর্ম্মাভাবে এ দিকে সে দিকে ঘুরিয়া বেড়াইতেছিল। কিন্তু শুধু শুধু এরূপে ঘুরিয়া বেড়াইতে ভাল লাগিল না। খানিক ঘুরিয়া ফিরিয়া সে মেনীর কাছে গিয়া বলিল, “আয় মেনি, তোকে সাজিয়ে দিই।”

মেনীর কিন্তু তখন সাজিবার প্রবৃত্তি আদৌ ছিল না, মাতার লাঞ্ছনা তাহাকে নিতান্ত কাতর করিয়া তুলিয়াছিল। সুতরাং গৌরীর সাজাইবার ইচ্ছার উত্তরে সে মুখ বাঁকাইয়া বলিল, “না।”

সাজসজ্জায় তাহার আপত্তি কোন দিন না থাকিলেও আজ বিবাহের দিনেও তাহাকে সাজিতে অনিচ্ছুক দেখিয়া গৌরী ঈষৎ হাসিয়া বলিল, “আ মরণ, আজ বিয়ের দিনেও একটু সাজগোজ করবি না ?”

দৃঢ়স্বরে মেনী উত্তর করিল, “নাঃ।”

গৌরী বলিল, “তবে এই চেহারাতেই গিয়ে বিয়ের আসরে বসবি ?”

নতমুখে গম্ভীরকণ্ঠে মেনী উত্তর দিল, “হাঁ।”

গৌরী একটু হাসিয়া বলিল, "কেন বল্ দেখি, বুড়া বর হয়েছে এই দুঃখে ?"

মেনী নিরুত্তরে মুখ তুলিয়া গৌরীর মুখের উপর সকাতর দৃষ্টি নিক্ষেপ করিল। বালিকা হইলেও গৌরী সে দৃষ্টির অর্থ কতকটা বুঝিল। আহা, হাজার কুরূপ কুৎসিত হউক, মানুষ তো বটে, আর সকল মানুষের মতই তো সে সুখ-দুঃখ অনুভব করিয়া থাকে। মেনীর উপর গৌরী কোন দিনই প্রসন্ন ছিল না; কিন্তু যে দিন সে শুনিল, একটা স্থবির বুড়ার সঙ্গে মেনীর বিবাহ হইবে, সেই দিন হইতেই তাহার প্রাণে যেন আপনা হইতেই মেনীর প্রতি কেমন একটা সহানুভূতি জাগিয়া উঠিল। তাহার মনে হইতে লাগিল, ইহা মেনীর বিবাহ নয়, বলিদান। ছি ছি, মেনীর মা কি নিষ্ঠুর !

আজ আবার মেনীর কাতর দৃষ্টিটা তাহার চিত্তকে সম্পূর্ণ আর্দ্র করিয়াছিল, এবং সে বুড়া বরের উল্লেখ করিয়া যে ভয়ানক অন্যায় করিয়াছে ইহা বুঝিয়া লজ্জিত হইয়া পড়িল! তাহার মনে হইল, মেনী যেন এই কাতরপূর্ণ দৃষ্টি দ্বারা নীরব ভাষায় আপনার প্রাণের বেদনা ব্যক্ত করিয়া কাঁদিতে কাঁদিতে বলিতেছে, "ওগো, আমি তো মরিতেই বসিয়াছি, তোমরা আর মরার উপর খাঁড়ার ঘা দিও না।" মেনীর বেদনা-বিমলিন মুখের দিকে চাহিতেই গৌরীর চোখ দুইটা সজল হইয়া আসিল। সে আপনার অন্যায়টাকে সংশোধন করিয়া লইবার অভিপ্রায়ে শান্ত কোমলকণ্ঠে বলিল, "তা কি করবি ভাই, এ তো মানুষের হাত নয়, বিধাতার ভবিতব্য। বিধাতার কলম কেউ কি রদ্ কত্তে পারে ?"

মেনী ঘাড় নীচু করিয়া নিরুত্তরে বসিয়া রহিল। গৌরী ধীরে ধীরে তাহার পশ্চাতে আসিয়া, পাক দিয়া জড়ান চুলের গোছাটা

খুলিয়া দিতে দিতে বলিল, "চুলগুলোকে এ কি ক'রে রেখেছিস্? ছি ভাই, আজকার দিনে কি মাথা এমন ক'রে রাখে?"

চুলের গোছা খুলিয়া দিয়া, তেল-চিরুণী লইয়া গৌরী তাহার মাথা বাঁধিয়া দিতে বসিল। তাহাকে না-ছোড়বান্দা দেখিয়া মেনী আর কোনরূপ আপত্তি করিল না।

নিস্তারিণী কাছে আসিয়া সহাস্যমুখে বলিলেন, "দে তো মা, চুলটা বেঁধে, পোড়া মেয়ে কিছুতেই আমাকে মাথায় হাত দিতে দেবে না।"

গৌরীও একটু হাসিয়া উত্তর করিল, "তুমি ওর পছন্দ সই চুল বাঁধতে জান না, তাই তো তোমাকে বাঁধতে দেয় না মামী মা।"

"তা তুই পছন্দসই ক'রে বেঁধে দে।" বলিয়া নিস্তারিণী হাসিতে হাসিতে কার্য্যান্তরে চলিয়া গেলেন। চুলের গোছার উপর চিরুণী চালাইতে চালাইতে গৌরী ডাকিল, "হাঁ ভাই মেনী!"

কি সুমিষ্ট সম্বোধন! গৌরীর মুখে এমন সুমিষ্ট সম্বোধন মেনী আর কখন শুনে নাই; আজ শুনিয়া আনন্দের উচ্ছ্বাসে তাহার চোখ দুইটা জলে ভরিয়া আসিল। অশ্রুগদগদকণ্ঠে উত্তর দিল, "কেন ভাই গৌরি?"

"তোর বড় দুঃখ্যু হচ্চে, না?"

"কিসের দুঃখ্যু ভাই?"

তিরস্কারের স্বরে গৌরী বলিল, "আ মরণ, কিসের দুঃখ্যু, আমি যেন জানি না। সত্যি, ভাই, আমি হ'লে তো কেঁদেই ভাসিয়ে দিতাম।"

ম্লান হাসি হাসিয়া মেনী বলিল, "কেঁদে ভাসিয়ে কি করবো ভাই! তুই তো বললি, যার যেমন কপালের লেখা।"

তর্জ্জন সহকারে গৌরী বলিল, "রেখে দে তোর কপালের লেখা। আমি হ'লে কপালে মুগুর মেরে কপালের লেখা মুছে দিতাম।"

মেনী মুখ টিপিয়া মৃদু মৃদু হাসিতে লাগিল। তাহাকে হাসিতে দেখিয়া গৌরীর রাগ হইল; সে রাগে মেনীর চুলের গোছায় একটা মৃদু টান দিয়া সকোপ তিরস্কারের স্বরে বলিল, "মুখে আগুন! তুই হাসচিস্ মেনী ?"

মৃদু হাস্য সহকারেই মেনী উত্তর করিল, "হাস্‌বো না তো কাঁদ্‌বো কি ?"

গৌরী বলিল, "কাঁদিস্ না কাঁদিস্, তোর মুখে যে হাসি আস্‌চে কি ক'রে, তোর হাসি দেখে আমার তো কান্না পাচ্চে।"

মেনী বলিল, "কান্না পায়, চুলটা বেঁধে দিয়ে, ঘরে গিয়ে তুই প্রাণ ভরে কাঁদ্।"

মাথা নাড়িয়া গৌরী বলিল, "শেষ পর্য্যন্ত না দেখে ঘরে আমি যাচ্চি না। বুড়োর পাকা চুলে টোপর কি রকম সাজে, তা আমি দেখবোই দেখবো।"

বলিয়া সে ক্ষিপ্রহস্তে চুলের গোছার উপর চিরুণী চালাইতে লাগিল। চিরুণীর সবেগ সঞ্চালনে কাতর হইয়া মেনী বলিল, "চুলগুলো আজ রেখে দিস ভাই!"

ভ্রূকুটি করিয়া গৌরী বলিল, "রেখে কি হবে? বুড়োকে খোঁপার বাহার দেখাবি নাকি ?"

ঈষৎ হাসিয়া মেনী বলিল, "তোর দেখছি বুড়োর ওপর ভয়ানক রাগ। কেন, বুড়োরা কি মানুষ নয় ?"

গৌরী বলিল, "মানুষ, কিন্তু বুড়ো মানুষ।"

মেনী বলিল, "মানুষ তো বটে।"

তর্জ্জন সহকারে গৌরী বলিল, "তোর যে বুড়োর ওপর বড্ড দরদ দেখছি।"

মেনী বলিল "কপালে যা জোটে, তাই নিয়েই সন্তুষ্ট হওয়া উচিত। অসন্তোষে দুঃখটাকে আরো বড় ক'রে তোলা হয় মাত্র।"

বিরক্তিতে মুখখানাকে বিকৃত করিয়া গৌরী বলিল, "হাঁগো পণ্ডিত মশাই তাই হয় বটে, এখন চুপ ক'রে একটু বসো দেখি, আমার কাজটুকু সেরে নিই।"

কিন্তু কাজ সারিয়া যাওয়া সহজ হইল না, চুল বাঁধা কিছুতেই পছন্দমত হইয়া উঠিল না। একবার খোঁপা বাঁধিয়া আবার খুলিয়া ফেলিল; আবার বাঁধিয়া আবার খুলিল। এইরূপে দুই তিনবার খোঁপা বাঁধার পর পরিশেষে বিরক্ত হইয়া বলিল, "দূর হোক্ ছাই, কি হবে এত পছন্দসই ক'রে খোঁপা বেঁধে? যা হ'য়েছে, তাই ঢের।"

কোনরূপে চুলবাঁধা শেষ করিয়া, উত্তমরূপে মুখ মুছাইয়া দিয়া গৌরী তাহার কপালে চন্দনের টীপ পরাইতে বসিল।

শশীর মা আসিয়া ব্যস্তভাবে বলিল, "আর এত সাজাতে হবে না; বর আসচে, ঘরে নিয়ে চল।"

গৌরী চন্দনের বাটী ফেলিয়া ঊর্দ্ধশ্বাসে বর দেখিতে ছুটিল।

কিন্তু বর কোথায়? দরজার বাহিরে পা দিতেই সম্মুখে উপেনকে দেখিয়া গৌরী থমকিয়া দাঁড়াইল; সবিস্ময়ে বলিয়া উঠিল, "উপীনদা যে? তুমি কোথা থেকে এসে পড়লে?"

সহাস্যে উপেন বলিল, "বরের সঙ্গে এসে পড়েছি। ভাল আছিস্ ত গৌরী?"

গৌরী বলিল, "হাঁ, ভাল আছি। বর কোথায়?"

এখনও মেনীর বর আসে নাই শুনিয়া উপেন বিস্মিত হইল। তা হইলে তাহার অনুমানটাই ঠিক হইয়াছে। সেই চক্‌চকে বুড়োটাই

মেনীর বর হইতে আসিতেছিল। রেলগাড়ীতে সেই যে সেই বরযাত্রীটা বুড়ো বরটার হাঁপানি বাড়িয়া উঠায় ব্যস্ত হইয়া পড়িয়াছিল, আর বাজারে যে বুড়ো দাদামশাইএর সর্দ্দি গর্ম্মী লাগিয়াছিল, সে আর অপর কেহ নহে, সেই বুড়োটা নিশ্চয়ই মেনীর বর।

উপেন বলিল, "বর এখনো অনেক দূরে—রসুলপুরের বাজারে।"

গৌরী জিজ্ঞাসা করিল, "কখন্ আসবে?"

উপেন বলিল, "তার ঠিক নাই; হঠাৎ সর্দ্দি গর্ম্মী হয়ে একটা দোকানে প'ড়ে রয়েছে, কবরেজ এসে ওষুধপত্র দিচ্চে। বুড়ো যদি বাঁচে, শেষ রাত্রি নাগাদ এসে পৌঁছাবে। সকলে ভাববে ব'লে আমি আগে সংবাদ দিতে এসেছি।"

এই দুঃসংবাদ শ্রবণে সকলেই চিন্তিত হইয়া পড়িল। সর্ব্বনাশ, 'একে বুড়ো মানুষ, তাহাতে সর্দ্দিগর্ম্মি; বাঁচিলে শেষ রাত্রি নাগাদ আসিতে পারে, কিন্তু বাঁচিবে কি? নিস্তারিণী তো সংবাদ শুনিয়া আছাড় খাইয়া পড়িলেন। হা ভগবান্, বুড়া বরের হাতে কন্যাদান, তাহাতেও এই বিভ্রাট! ওগো, বড় আদরের মেয়ে, বলিয়া মেনীর কপালে কি এত দুঃখ! নিস্তারিণী উঠানের ধূলায় পড়িয়া মাথামুড় খুঁড়িয়া কাঁদিতে লাগিলেন।

পদ্মঠাকরুণ আসিয়া তাঁহাকে ধমক দিয়া বলিলেন, "মর মাগী, চেঁচাবি এর পর। এখন জাতকুল মান ইজ্জৎ যায় যে, তার উপায় কি?"

উপায় যে কি আছে, তাহা কেহই ভাবিয়া পাইল না। দয়ারাম তো মাথায় হাত দিয়া বসিয়া পড়িয়াছিল। পদ্মঠাকরুণ তাহাকে ডাকিয়া বলিলেন, "এখন উপায় কি দয়ারাম দাদা? বুড়ো বাঁচবে কি মরবে

তার তো ঠিক নাই। কিন্তু মেয়ের হাতে সূতো বাঁধা, মেয়েকে পাত্রস্থ না করলে তো জাতকুল বজায় থাকবে না।"

দয়ারাম বলিল, "তা তো থাকবে না জানি, কিন্তু পাত্র কোথায় যে, মেয়েকে পাত্রস্থ করবে?"

পদ্মঠাকরুণ বলিলেন, পাত্র একটি আছে। এখন তুমি যদি বল—"

সাগ্রহে দয়ারাম বলিয়া উঠিল, "এর আর বলাবলি কি, পাত্র যদি পাওয়া যায়—"

পদ্মঠাকরুণ বলিলেন, "যদি পাওয়া যায় কি, পাওয়া গিয়াছে। আয় না তবে উপেন।"

উপেন নিকটেই দাঁড়াইয়াছিল, পদ্মঠাকরুণ গিয়া তাহার হাত ধরিলেন। দয়ারামের এতক্ষণে চমক হইল। পাত্র উপেন? হউক, ক্ষতি নাই, কিন্তু টাকা? মাথা চুলকাইতে চুলকাইতে দয়ারাম বলিল, "তা মন্দ হবে না দিদি ঠাকরুণ, কিন্তু—"

পদ্মঠাকুরুণ তাহার এই কিন্তু কথার অর্থ বুঝিয়া লইয়া বলিলেন, "টাকার কথা তো? টাকা নগদ চার শো পাবে। একটা স্ত্রীহত্যা ক'রে পাচ্ছিলে দু'শো, এবার না হয় একটা ভদ্রলোকের জাতকুল রক্ষা ক'রে স্ত্রীহত্যার পাপ থেকে মুক্তি পেয়ে পাবে চার শো। কোন্‌টা ভাল দয়ারাম দাদা? ভাল হোক, মন্দ হোক, পদ্ম বাম্‌নী যখন ধরেছে, তখন সে ছাড়বে না। তোমার টাকার জামিন রইলুম আমি। আয় উপেন।"

পদ্মঠাকরুণ উপেনকে টানিয়া লইয়া গিয়া বরের আসনে বসাইয়া দিলেন; পুরোহিতকে ডাকিয়া বলিলেন, "নাও পুরুতমশায়, মন্ত্রগুলো পড়িয়ে দাও।"

গাঁটছড়া

দয়ারাম নিতান্ত হতবুদ্ধির ন্যায় হাঁ করিয়া পদ্মঠাকরুণের মুখের দিকে চাহিয়া দাঁড়াইয়া রহিলেন। ততক্ষণে পুরোহিত মহাশয় বিবাহের মন্ত্রপাঠ আরম্ভ করিয়া দিয়াছেন :—

এনাং সালঙ্কৃতাং কন্যাং তুভ্যমহং সম্প্রদদেৎ।

* * * *

গৌরী বরক'নের গাঁটছড়া বাঁধিয়া দিয়া হাসিতে হাসিতে বলিল, "কেমন উপীনদা, আমার সেই খেলার গাঁটছড়া বাঁধা সত্যিকার গাঁটছড়া বাঁধা হয়ে গেল কি না! এইবার তুমি কাকে মারবে? মেনীকে, না আমাকে?"

উপেন দাঁতে ঠোঁট চাপিয়া তাহার মুখের দিকে সহাস্য কটাক্ষ নিক্ষেপ করিতেই গৌরী উলুধ্বনি দিয়া পোঁ করিয়া শাঁখ বাজাইয়া দিল।

শুভ-মিলন

কলস কাঁখে, নোলক নাকে, আল্‌তা পরা পায়,
নূপুর বাজে ঝুমুর ঝুমুর বন্ধুর বৌ যায়।

সুপ্রসিদ্ধ প্রবীণ সাহিত্যিক

ন্দ্রনাথ পাল ফণী, বি, এ, ণীত

বন্ধুর-বৌ

গভীর রহস্যময়, নূতন ধরণের উপন্যাস। চির সমাদৃত।

নবরসের অফুরন্ত নির্ঝর-ধারা

রস-মন্দাকিনী।

বন্ধুর-বৌ

প্রেমলীলা-লহরিত সুললিত সুধা-ঝরা অপূর্ব্ব উপন্যাস।

ভাষার লালিত্যে, গল্পের নূতনত্বে, ভাবের বৈচিত্র্যে অতুলনীয়।

বাঙ্গালীর ঘরের সুখ-দুঃখ, সংগ্রাম, পূর্ব্বরাগ ও

—প্রেমের চিত্র—

কমলিনী-সাহিত্য-জগতের একাদশটি সুরক্ষিত দুর্গ

দেব-সাহিত্য-কুটীর অবরোধ করিয়াছে।